কিশোর গল্প

ইচ্ছেগুলো ডানা মেলে

আহসান হাবিব বুলবুল

ইচ্ছেগুলো ডানা মেলে

আহসান হাবিব বুলবুল

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
ঢাকা, চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

ইচ্ছেগুলো ডানা মেলে

আহসান হাবিব বুলবুল

প্রকাশক
এস,এম, রইসউদ্দীন
পরিচালক প্রকাশনা
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম অফিস
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম, ফোনঃ ৬৩৭৫২৩

ঢাকা অফিস
১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
ফোনঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

প্রকাশকাল
একুশে বই মেলা ২০০৮

মুদ্রাকর
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড
১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০,
ফোন ঃ ৯৫৭১৩৬৪/৯৫৬৯২০১

প্রচ্ছদ
মুবাশ্বির মজুমদার

অংকন
খলিল রহমান

ডিজাইন
ডিজাইন বাজার
৪৮ এবি পুরানা পল্টন, বাইতুল খায়ের টাওয়ার
ঢাকা-১০০০, ফোন-৭১৭১৯৭৫

মূল্য ঃ ১০০.০০ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম
১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
১৫০-১৫২, গভ: নিউমার্কেট, আজিমপুর,ঢাকা
৩৮/৪, মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলা বাজার, ঢাকা

Ichcheyagulo Dana Meley, Written by Ahsan Habib Bulbul, Published by S.M. Rais Uddin, Director Publication, Bangladesh Co-operative Book Society Limited, 125 Motijheel C/A, Dhaka. Price: TK. 100.00, US$. 3.00

ISBN-984-493-108-8

www.pathagar.com

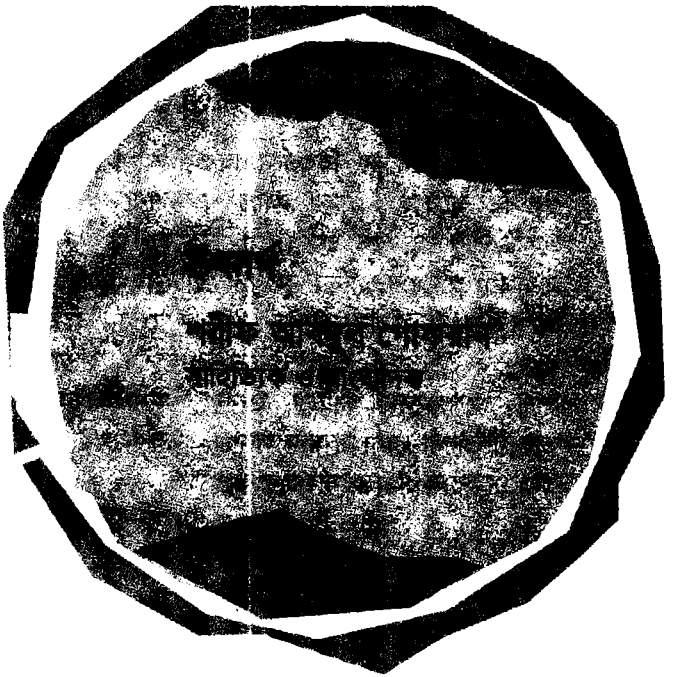

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

শিশুসাহিত্য সময়ের বিবর্তনে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হয়েছে। দাদুর কাছে গল্প শুনতে শুনতে একটি শিশু বড় হয়ে ওঠে। গল্প সাহিত্যের একটি বড় মাধ্যম। আহসান হাবিব বুলবুল ছোটদের নিয়ে গল্প লিখে থাকেন। তিনি দু'দশক ধরে লিখছেন। বইয়ের গল্পগুলো ইতিপূর্বে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। শিশু-কিশোরদের বিচিত্র ভাবনা, মান-অভিমান, তাদের ভালো লাগা ও মন্দ লাগা- এসব নিয়েই তিনি তাঁর গল্পের কথামালা সাজানো হয়েছে।

শিশুদের ঘিরে প্রকৃতি-পরিবেশের উপাত্তই তাঁর লেখার উপজীব্য। তার লেখায় দেশপ্রেম, স্বপ্ন ও নৈতিক শিক্ষার দিকটিও ফুটে উঠেছে।

আহসান হাবিব বুলবুলের ভাষা সাবলীল। শিশু মননের প্রতি সজাগ দৃষ্টি, শব্দ চয়ন তাঁর লেখায় গতি এনেছে প্রবলভাবে। বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ-এর নতুন প্রকাশিত "ইচ্ছেগুলো ডানা মেলে" গল্পগ্রন্থটি পাঠ করে শিশু-কিশোরদের মনে একদিকে শিক্ষা অন্যদিকে আনন্দের সঞ্চার করতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

(এস,এম, রইসউদ্দীন)
পরিচালক প্রকাশনা
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.pathagar.com

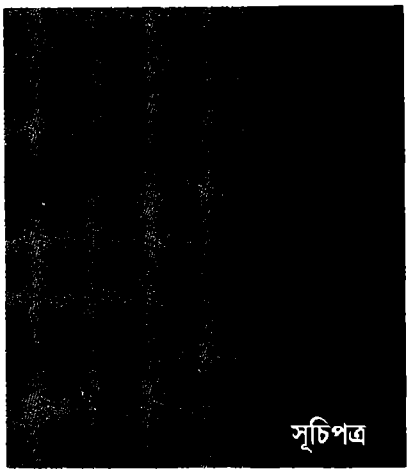

সুমনের যত ইচ্ছে # ০৭
সুবাসিত দাদু # ০৯
আঁচল ভরা ফুল # ১২
বন্ধুর জন্য ভালোবাসা # ১৫
প্রভাতফেরী # ১৮
তুহিন # ২১
শাওনের গল্প দেখা # ২৩
ঝন্টু # ২৬
ফুল মেয়ে জরি # ২৯
চিঠি # ৩৪
সেই ছেলেটি # ৩৭
হাসে বাঁকা চাঁদ # ৩৯
রতন # ৪৩
বাবা আসেনি # ৪৫

www.pathagar.com

সুমনের যত ইচ্ছে

সুমন ডাক্তার ডাক্তার খেলছে। ছোট বোন মিতু পুতুল কোলে নিয়ে তাকে দেখাতে এল। মিতুর মন খারাপ। পুতুলের অসুখ। ডাক্তার পুতুলের ফুসফুস, হৃদস্পন্দন পরীক্ষা করার পর একটু হেসে বললঃ বাচ্চা খুব ভাল আছে। ওষুধ খাওয়া বা ইনজেকশন নেয়ার দরকার নেই। এ কথা শুনে মিতু খুব বেশি হল।

অনেক দিন পর মেঝ মামা এলেন বেড়াতে। মামাকে পেয়ে সুমন আর মিতু খুব খুশি হল। রাতে মামাকে ঘিরে ওরা আসর জমালো। আসরে আম্মুও যোগ দিলেন। সুমন ও মিতুর অনেক কথার ফুলঝুরি ফুটল। গল্প হল, কবিতা হল।

মামা বললেন ঃ 'সুমন তুমি বড় হলে কি হবে?'

সুমন বলল ঃ কেন ডাক্তার হব। ও' স্টেথিসকোপটা বের করে মামার হার্টবিট পরীক্ষা করতে শুরু করল।

মামা বললেন ঃ সাবাস ভাগ্নে ! সাবাস বাংলাদেশ !

- মামা থাকেন আমেরিকার টরেন্টো শহরে। কম্পিউটার নিয়ে পড়াশুনা করছেন। সপ্তম বিশ্বকাপ ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হবার পর একদিন টেলিফোন বেজে উঠল। সুমনের ফোন সুদূর বাংলাদেশ থেকে। মামা ধরলেন।

ঃ হ্যালো মামা, আমি সুমু। কেমন আছেন ?

ঃ ভাল আছি মামা। তোমরা সবাই ভাল?

www.pathagar.com

ঃ হ্যাঁ ভাল! একটা খবর আছে মামা।

ঃ কি খবর! জলদি বলে ফেল।

ঃ এইম ইন লাইফটা চেইঞ্জ করে ফেলেছি মামা ! ভাবছি ক্রিকেটার হব।

ঃ তাই ! তা বেশ তো।

ঃ মামা তুমি আমার জন্য একটা ফেন্সি ব্যাট পাঠিও।

ঃ ও-কে মামা। তাই হবে। ইউ মে গুড ক্রিকেটার।

- মামা টারেন্টো থেকে এক বন্ধুর হাতে একটা ক্রিকেট সেট পাঠালেন সুমনকে।

এবার বিশ্বকাপ ফুটবলের পর আবার দেশে এলেন মামা। সুমনকে দেখে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন তিনি। সুমন বেশ বড় হয়েছে। একটা বড় বল নিয়ে ঘরের মধ্যেই রীতিমত প্রাকটিস করছে।

ঃ আশ্চর্য হবার কিছু নেই মামা। আমি জীবনের লক্ষ্যটা আবারো পরিবর্তন করেছি। আমি রোনাল্ডো হতে চাই। মামা স্বভাবগতভাবে এবারো বললেন ঃ সাবাস মামা! সাবাস বাংলাদেশ। রাতে আসর বসল। আব্বু আম্মুও যোগ দিলেন। মিতু তো আছেই। কথা হল। সে অনেক কথা।

সুমন বললঃ আসলে মেঝ মামা! আমার সব হতে ইচ্ছে করে। টেলিভিশনে যখন গান শুনি তখন খুব গাইতে ইচ্ছে করে। আর্ট গ্যালারিতে যখন প্রদর্শনী দেখতে যাই তখন বড় শিল্পী হতে ইচ্ছে করে। আচ্ছা মামা! কি করলে সব হওয়া যায়!

- মামা একটু অপ্রস্তুত হলেন। মামা মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললেন তা-তোমাকে দার্শনিক হতে হবে।

ঃ দার্শনিক মানে কি মামা?

ঃ দা-র্শ-নি-ক মানে - হল জ্ঞানী। বিদ্বান আর কি !

ঃ সে জন্য কি করতে হবে মামা ?

ঃ লেখাপড়া করতে হবে। পড়ার সময় পড়া, খেলার সময় খেলা। তবেই তুমি জ্ঞানী হতে পারবে।

- মিতু বলে উঠল ঃ আমি জ্ঞানী হব মামা ! এই আমার হাতে ছড়িটা দেখছ না! আমি হব কানাই মাস্টার, 'পড় মোর বিড়াল ছানাটি .....?' এবার আসরের সবাই হেসে ফেলল। আব্বু বললেন ঃ মিতু ঠিকই বলেছে। যে জ্ঞানী সেই তো শিক্ষক। ডাইনিং টেবিলের মজাদার সব খাবারের ঘ্রাণে আসরের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হল।

www.pathagar.com

সুবাসিত দাদু

প্রতিদিন একটি দৃশ্য খুব তন্ময় হয়ে দেখে অমিত। দেখেই যত সুখ। আসর ও মাগরিবে নিয়মিত মসজিদে আসা হয় ওর। জামায়াত দাঁড়াবার আগে কিছু সময় কেটে যায় এক অবর্ণনীয় সুখানুভূতিতে। একটা বেহেশতী দৃশ্য ওকে পুলকিত করে। আপ্লুত করে বার বার। কে উনি ! কিসের টানে ছুটে যান সবার কাছে। আকাশের তাবৎ শান্তি যেন তাঁর শ্বেত শুভ্র শ্মশ্রুমন্ডিত চোখে মুখে আছড়ে পড়ছে। অমিতকেও যেন সে সুখ ছুঁয়ে যায়। অমিত ডান হাতটা এগিয়ে দেয়। ঠিক যেন তার দাদু এভাবেই স্পর্শ করে হাতে আতর দেখে দিতেন।

মুরব্বী লোকটি অমিতের কপোল ছুঁয়ে চুমু খান। অমিত আতরমাখা হাতটা নিজ চোখে-মুখে বুলিয়ে নেয়। অমিত বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে থাকে পরম শান্তিতে। ভাবে কেন এই বৃদ্ধ প্রতিদিন মুসল্লীদের মাঝে সুবাস বিলান। প্রতিটি মুসল্লীর হাতে মেখে দেন আতর। হাঁটতে কষ্ট হয়। তারপরও পা-পা করে পৌঁছে যান প্রত্যেকের কাছে। পরম তৃপ্তিতে হাসিমুখে।

অমিতের দাদুর কথা তেমন একটা মনে পড়ে না। বাবার কাছে দাদুর গল্প শুনেছে অনেক।

- "একাত্তরে ভীষণ যুদ্ধ। পাক বাহিনী উল্লাপাড়া পাট বন্দরে আগুন ধরিয়ে দেয়। শহরের উপকণ্ঠে ঘাটিনা রেল ব্রীজে প্রতিরোধ যুদ্ধ হয়। শেলের আওয়াজে চারদিকে প্রকম্পিত হতে থাকে। বাবা তখন ছোট। স্কুলে পড়েন। আমার দাদু তখন সবাইকে নিয়ে শহর ছেড়ে গ্রামের পথে পাড়ি জমান। কিন্তু বাঁধ সাধল

www.pathagar.com

নদী। খরস্রোতা ফুলজোড়া। দাদু ছিলেন খুব সাহসী। দাদু বাবাকে কাঁধে তুলে নদী পার হয়েছিলেন।'

- "দাদু সুবহে সাদিকে উঠে পড়তেন। বাড়ীর মসজিদে আজান দিতেন। নিজ হাতে বাগানবাড়ি পরিষ্কার করতেন। আমার ছোট ফুফি তখন খুবই ছোট। কাঁঠালতলায় একটা ঝরা পাতার জনা আধো আধো বোলে ডাকতেন, "আল্লাহ একটা কাতালের পাতা দ্যাও।"

- "কাঁঠাল তলায় বাঁশের একটা মাচা ছিল। একটু শীতল ছায়ায় প্রাণ জুড়াতে সবাই ওখানটায় বসত। দাদু ঐ মাচায় বসে বিকেলে তাজকেরাতুল আওলীয়া পড়তেন। পড়তে পড়তে হাউ-মাউ করে কাঁদতেন।

-" দাদুর হাতে দাদুর সমান একটা লাঠি থাকত। লাঠি তো নয় যেন রাজদন্ড। দাদুর সামনে কেউ মিথ্যা বলতো না। অন্যায় করতে সাহস পেতো না। দাদুকে সমাজের সবাই মান্য করতো।"

বাবার মুখে শোনা দাদুর এ খন্ড স্মৃতিকথাগুলো আজ খুবই চিরচেনা মনে হয় অমিতের।

আজ বৃহস্পতিবার। হাফ স্কুল! সকাল-সকাল ছুটি হয়ে গেছে। অমিতের প্রতিদিনের অভ্যাস আসরের নামাজ পড়ে খেলতে যাওয়া। ও আজানের আগেই মসজিদে এসে পড়ে। সাহস করে দাদুর কাছে গিয়ে বসে।

ঃ আস্‌সালামু আলাইকুম।

ঃ ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছো দাদু ভাই।

ঃ আলহামদুলিল্লাহ।

ঃ তোমাকে দেখেই বুঝেছি তুমি সত্য পিপাসু হবে।

ঃ দোয়া করবেন। আমার দাদু নেই, আপনাকে দাদু ডাকতে চাই।

ঃ অবশ্যি ডাকবে। অবশ্যি। তোমার মত আমার একটা নাতি আছে। ওরা বিদেশে থাকে।

ঃ দাদু ! আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই।

ঃ অবশ্যি করবে। ওঠো, তাহলে শুরু করা যাক।

- দাদু অমিতের হাতে এক শিশি আতর তুলে দেন। তারপর দু'জনে এগুতে থাকেন মুসল্লীদের কাছে। এভাবেই সুবাস বিলাতে বিলাতে সখ্যতা গড়ে ওঠে দাদা ও নাতির।

অমিত বাবা-মার কাছে সুবাসিত দাদুর অনেক গল্প করেছে। দাদু একজন উচ্চ পদস্থ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা। তাঁর দুই মেয়ে, এক ছেলে। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলে থাকে আমেরিকায়। ছেলের ঘরে এক ছেলে আছে। তারা কালেভদ্রে দেশে আসে। দাদা-দাদী এক রকম নিঃসঙ্গই বলা চলে। মেয়েরা

www.pathagar.com

খোঁজ-খবর নিয়ে চলে যায়। ছেলে, ছেলে বউ আমেরিকায় নিয়ে যেতে চেয়েছেন। কিন্তু দাদু রাজি হননি। দেশের মায়া ছাড়তে পারেননি। দেশেকে ভালবেসে, এ দেশের মানুষকে ভালবেসে দেশের মাটিকেই আঁকড়ে ধরে রয়েছেন। এ ভালবাসা এক প্রাণশক্তি। যা আশি বছর বয়সেও দাদুকে সাহস জোগায়।

অমিত দাদা-দাদীকে দাওয়াত করেছে। বাবা-মার পাশে দাদুকে বসিয়ে খুব মজা করছে অমিত আজ। অনেক দিনের পুষে রাখা প্রশ্নটা আজ দাদুকে করতে ইচ্ছা করছে ওর।

ঃ আচ্ছা দাদু ! তুমি সুবাস বিলাও কেন?

ঃ আমাদের নবীজী (সাঃ) সুগন্ধি পছন্দ করতেন তাই ....।

হাদীসের সেই কাব্য রূপটি পড়নি?

"জোটে যদি মোটে একটি পয়সা খাদ্য কিনিও ক্ষুধার লাগি, দু'টি যদি জোটে তবে অর্ধেকে ফুল কিনে নিও হে অনুরাগী।"

জীবনে তো অনেকটা পথ পাড়ি দিয়ে এলাম। হয়ত অনেক ভুল হয়ে গেছে। কখন কোন কাজটা আল্লাহ পাক পছন্দ করেন, তা তো বলা যায় না। তাই সুবাস বিলাই। যদি আল্লাহ মাফ করেন।

দাদুর কথায় অমিত নিজের ভেতর একটা নতুন ভুবন রচনা করে। নদী ফুল পাখি। দিগন্ত জোড়া মাঠ। এক পাশ দিয়ে চলে গেছে মেঠো পথ। দাদুর সাথে হাঁটছে অমিত। ধানের ক্ষেতে দোল খেয়ে যাচ্ছে পূবালী বাতাস। মাথার ওপর শ্বেত কপোতরা উড়ছে। দাদু গল্প শুনাচ্ছে। জীবনের গল্প, ভালবাসার গল্প, স্বাধীনতার গল্প।

- দাদুর ডাকে সম্বিত ফিরে পায় অমিত।

ঃ এবার তা হলে ওঠা যাক দাদু !

- অমিত দাদুকে বাসা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসে।

পৌষের অপরাহ্নে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যায়। সাগরে নিম্নচাপ হয়েছে। আকাশটা তাই একটু মেঘলা। মেঘ কেটে গেলেই শীত জেঁকে বসবে। আসরের আজান হয়ে যায়। অমিত মসজিদে এসে দৃষ্টি মেলে, দাদু এসেছেন কিনা। দাদুকে না দেখে ও সামনের কাতারের এক পাশে গিয়ে বসে।

- "দাদু দেরি করছে কেন। অসুখ-বিসুখ করলো না তো! হয়ত এক্ষুণি এসে পড়বে। নাঃ দাদুতো আসছে না। তাহলে কি আজ সুবাস বিলানো হবে না।"

- অমিত উঠে দাঁড়ায়, ওর হাতটা কাঁপে। পা-পা করে এগিয়ে যায়। সুবাসে ভরে ওঠে মুসল্লীদের হৃদয় মন।

নামাজ শেষে দাদুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় অমিতের। দাদু এসেছেন! অমিতের মনটা খুশিতে ভরে ওঠে।

www.pathagar.com

আঁচল ভরা ফুল

নাজমা থেকে নাজু আর শিমুল থেকে শিমু। ডাক নাম দু'টো বেশ মিষ্টি ওদের। একই ক্লাসে পড়ে ওরা। পাশাপাশি বাড়ি। ঘুম ভাঙ্গলেই দেখা হয় দু'জনের। চড়ুই ভাতি খেলে, পুতুলের বিয়ে দিয়ে, হৈ-চৈ করে দিন কটে যায় ওদের। সেই সঙ্গে কে ক'টা কবিতা, ছড়া মুখস্থ করবে সেই প্রতিযোগিতায় মত্ত ওরা।

সেদিন একটানা সুরে শুধু বৃষ্টি আর বৃষ্টি। নাজু ও শিমু আজ ঘরে আটকা পড়েছে। দু'জনের মনই ছটফট করছে। সমস্ত খেলাধুলা পন্ড আজ ওদের। ঘরে বসে ছড়াগান করাও কারো ভাল লাগছে না। যখন অপরাহ্নে বৃষ্টি থেমে মিষ্টি মিষ্টি রোদ্দুর বেরুলো। তখন ওদের মনে আনন্দ আর ধরে না। দু'জনে হাত ধরাধরি করে বেরিয়ে পড়েছে। সারা মাঠ জুড়ে আধহাঁটু পানি। দু'একটি দুষ্টু ছেলে মাঠের সেই পানিতে নেমে আনন্দ কুড়াচ্ছে।

ঃ আরেকটু পানি হলে সাঁতার কাটতে কি না মজাই হতো। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল ওরা একে অপরকে। এমন সময় সেই মিষ্টি রোদের মাঝে ইলশে গুঁড়ি।

ঃ এমন দিনে না শিয়াল মামার বিয়ে হয়, নাজু শিমুর হাত দুলাতে দুলাতে বলল।

ঃ কই শিয়াল মামাকে তো দেখছি না। তার বউ বা কোথায়, পালকি বা কোথায়? শিমুর জিজ্ঞাসা।

www.pathagar.com

ঃ জানিস, বিয়ে ঠিকই হচ্ছে। কিন্তু লজ্জা পেয়ে দেখা দিচ্ছে না। নাজু বলতে গিয়ে শিমুকে নিয়ে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে। ওকে দু'বাড়ির বড়রা ওদের খুঁজতে বেরিয়েছে। না জানি নাজু ও শিমু কোথায় গেল। সন্ধ্যা নেমে আসছে দেখে ওরাও বাড়ির দিকে পা বাড়িয়েছে। তারপর বিনিময়ের মিষ্টি সুরে হাত নেড়ে-নেড়ে খোদা হাফেজ- খোদা হাফেজ।

পরদিন থেকে মেঘ মুক্ত প্রকৃতিতে বেশ স্বচ্ছতা। শরতের আকাশ। ছায়াপথের সে কি স্নিগ্ধতা রাতের আকাশে। শিমু পড়ার টেবিলে বসে জানালার ফাঁকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সে দিকে। ও কেবলই ভাবছে সামনের সপ্তাহে ওর মেঝ মামা শরতের ছুটিতে বিদেশ থেকে আসছেন। সেই সঙ্গে মামী আর মামাতো বোন পুতুলও। নামও পুতুল দেখতেও যেন পুতুলের মত। ওরা উড়োজাহাজে আসবে ঐ আকাশ ছুঁয়ে মেঘমালার নূপুর পরে। কি মজাটাই না হবে। "আরে ! নাজুকে তো কথাটা বলাই হয়নি।" এই শুভ সংবাদটা সে কালই নাজুকে দেবে ভাবছে।

আজ ক'দিন হল নাজুর মনটা ভাল নেই। ও' একাই স্কুলে যায় আর আসে। দু'দিন শিমুকে ডাকতে গেছে নাজু। কিন্তু শিমুর দেখা পাওয়াই ভার। শিমুর মামা এসেছে। মামাতো বোন পুতুলকে নিয়ে বেশ মজে আছে সে। শিমুর মামা ওর জন্য বিদেশ থেকে অনেক কিছু এনেছে। শিমু তাই বেশ অহংকারী হয়ে উঠেছে। নাজু এতে খুব অভিমান করেছে। তাই আজকাল ফাঁকে থাকতেই ভালবাসে।

বেশ গরম পড়েছে। গাছের একটি পাতাও নড়ছে না। দূরে রোদ ঝলমল করছে। দুপুরটা ভীষণ বিষণ্ন লাগছে নাজুর কাছে। জানালার পাশে পড়ার টেবিলে বসে আছে নাজু। একগাদা কাগজ নিয়ে পেন্সিলে রাজ্যের সব আঁকিবুকি করছে। হয়তো ও' কিছু একটা আঁকতে চায়। শিমুর কথা, নিজের মনের কথা ! হাজারো রেখার টানে হয়তো এঁকেও ফেলেছে সে। কিন্তু এত সব হিজিবিজি বোঝার সাধ্য কার! একজন কিন্তু ঠিকই বুঝেছেন।

মা পাশে এসে দাঁড়ান। বলেন ঃ "মা মনি! শিমু আসে না, এক সাথে খেলা কর না বুঝি।"

ঃ ওর কথা বল না মা। ওরা বড় লোক। বিদেশ থেকে ওর মামা এসেছে; কত কি এনেছে। আমাকে তো ভুলেই গেছে।

www.pathagar.com

- অভিমান করে বলে নাজু।

ঃ ওভাবে বলে না মা। তোমার বন্ধু ঠিকই একদিন আসবে। সেদিন দেখ কত কথা হবে তোমাদের। - মা মেয়ের মান ভাঙ্গাতে চান। - নাজু আবার আঁকতে মন দেয়। কিছুদিন পর শিমু সত্যি সত্যি একা হয়ে পড়ে। নাজুর সঙ্গে মিল দেবে, কিন্তু লজ্জা- সংকোচ দুটোই শিমুকে পীড়া দিচ্ছে। কি করবে সে ভেবে পাচ্ছে না। সেদিন নাজুর কথামত ওর আম্মু ভোরে আজান শুনেই ওকে ঘুম হতে ডেকে দিয়েছেন। নাজুর স্কুলের এক আপা বিদায় নিয়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছেন আজ। বিদায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে আপাকে মালা দিতে হবে। নাজু সেই কাক ডাকা ভোরে বেরিয়ে পড়েছে বাগানের ফুল কুড়াতে। মাথার রুমালে সমস্ত ফুল কুড়িয়ে নিয়েছে নাজু। এমন সময় শিমুও এসেছে বাগানে ফুল কুড়াতে। ঘুম ভাঙতে দেরী হওয়ায় শিমু পিছে পড়ে গেছে। বাগানে তখন একটি ফুলও নেই। শিমু নিশ্চুপ চেয়ে আছে। ওর মুখে ভাষা নেই। নরম মিষ্টি অধরটা লাল হয়ে উঠেছে। চোখের কোণটা ভিজে যাচ্ছে। শিমুর মুখের দিকে তাকাতেই নাজুর খুব মায়া হয়। ও' দু'হাত ভরে ফুল তুলে দেয় শিমুর আঁচলে।

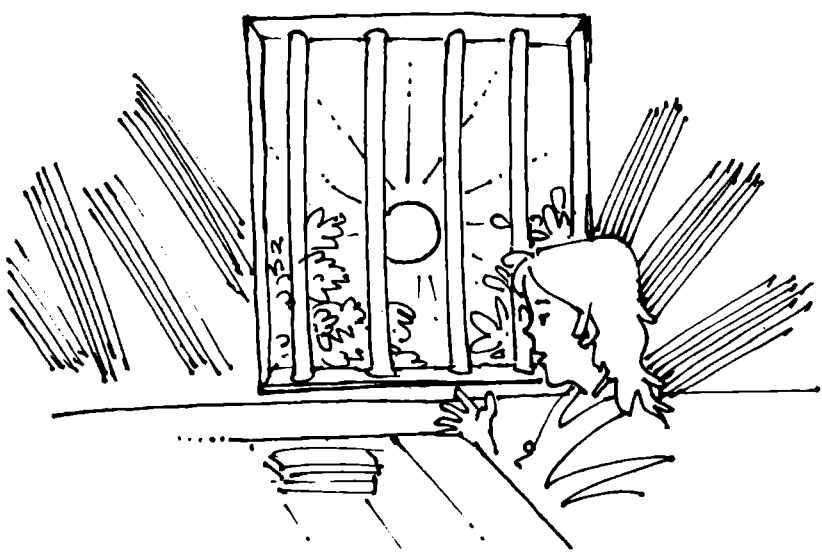

www.pathagar.com

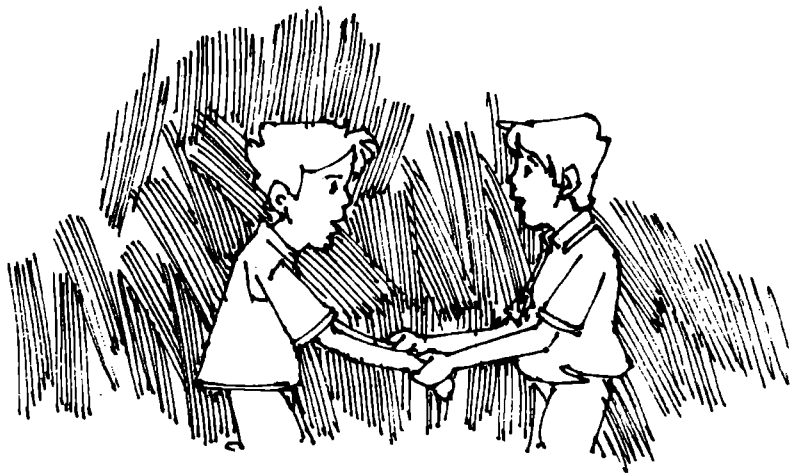

বন্ধুর জন্য ভালবাসা

বার বার মেঘের আড়ালে সূর্যটা হারিয়ে যাচ্ছে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যে মিষ্টি রোদ্দুর। বৃষ্টি ভেজা দখিনা বাতাস ছেলেমেয়েদের চুল ছুঁয়ে দিয়ে যাচ্ছে। শিশু-কিশোরদের হৈ-হুল্লা আর ছোটাছুটিতে জেগে উঠেছে স্কুল আঙ্গিনা। বাহারী রঙে সাজানো হয়েছে চারপাশ। স্কুলে আজ বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। সবাই পুরস্কার নিবে। যে কোন ইভেন্টেই ভাল করতে পারেনি, সেও পাবে সান্ত্বনা পুরস্কার। তাই সবার মনেই আনন্দ। এত আনন্দের মাঝেও দু'বন্ধুর মনে বিষাদের ছায়া।

রফিক ও আলম ওরা দুই বন্ধু। একই ক্লাসের ছাত্র। খেলার মাঠে। দৌড়-ঝাপ থেকে শুরু করে লেখাপড়া, ঘুরে বেড়ানো সব চলে এক সাথে। আলম একটু দুরন্ত। রফিক অতটা নয়। তবু কেউ কাউকে ছাড়া চলতে পারে না। রফিক অবশ্য মাঝে মধ্যে আলমের দুরন্তপনায় বিরক্ত বোধ করে। কিন্তু কিছু বলে না।

রফিকের আব্বা সরকারি চাকরি করেন। বদলী হয়ে এসেছেন নতুন উপজেলা শহরে। নতুন পরিবেশে রফিক সেদিন প্রথম স্কুলে গেছে। চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র রফিক। ক্লাস তখনো শুরু হয়নি। বেঞ্চে বসা নিয়ে সবাই হৈ চৈ করছে। রফিক যে সীটে বসেছিল দুষ্টু ছেলেরা সেখান থেকে ওকে উঠিয়ে দিয়েছে। ক্লাসের নতুন ছেলে হিসাবে ও কিছু বলছে না। শুধু শিক্ষকের আসার অপেক্ষা করছে। এমন

www.pathagar.com

সময় আলমের দৃষ্টি পড়ে ওর উপর। আলম ক্লাসের ফার্স্টবয়। এর আগে আলম ওকে দেখেনি। ভাবলো, হয়ত নতুন ছেলে। নতুন ভর্তি হয়েছে। আলম উঠে গিয়ে রফিককে ডেকে কাছে বসালো। সেই থেকে ওদের পরিচয়। অল্প দিনেই দু'জনে অনেক-চেনাজানা হয়ে ওঠে। মনে হয় ওদের বন্ধুত্ব অনেক দিনের।

একদিন দু'জনের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হয়। সেদিন সত্যি করে রফিকের মনটা ভাল ছিল না। আলম বিকেলে খেলার জন্য রফিককে বাসায় ডাকতে আসে। কিন্তু রফিক খেলেতে যায় না। আলমের ভারী রাগ হয়। ও ভাবে রফিক হয়ত তাকে এড়িয়ে যেতে চাচ্ছে। শুরু হয় মান-অভিমান। রপিক ব্যাপারটা বুঝতে পারে না। সেই থেকে দু'বন্ধুর মধ্যে কথা নেই।

ওরা এবার পঞ্চম শ্রেণীতে উঠেছে। রফিক ফার্স্ট হয়েছে। সেদিন দু'বন্ধুর আনন্দ দেখে কে। দু'জনই খুশিতে আটখানা। সেদিন ওরা একে অপরকে জড়িয়ে ধরেছে। বাসায় গিয়ে মিষ্টি খেয়েছে। বিকেলে খেলার মাঠে দু'জনে হাত ধরাধরি করে অনেক পথ হেঁটেছে। কথা হয়েছে হেসেছে, খেলেছে কিন্তু আজ দু'জনের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান।

পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শুরু হয়। রফিক আলম দু'জনই আসন নিয়েছে। তবে কেউ কাউকে দেখছে না। একটু পরেই নাম ডাকা হবে। প্রধান অতিথি পুরষ্কার হাতে তুলে দেবেন। মেধাবী ছাত্র হিসাবে দু'জনই পুরষ্কৃত হয়। পুরষ্কার নিতে মঞ্চে গিয়ে একবার দুই বন্ধুর চোখাচোখি হয়। দৃষ্টি কেউ বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেনি। এক পলকেই হৃদয়াবেগের অনেক কথা ওদের বলা হয়ে যায়। একটা মর্মবেদনা দু'জনকেই আহত করে। রফিক চায় আনন্দে আলমকে জড়িয়ে ধরতে। কিন্তু পারে না। একটা সংকোচবোধ বাধসাধে। আলমেরও ইচ্ছে করে আজকের এই আনন্দঘন মুহূর্তে হিপহিপ হুররে বলে চিৎকার করে রফিককে জড়িয়ে ধরতে। কিন্তু পারে না। 'কেমন করে আগে কথা বলি একটা লজ্জা সংকোচ ওকে ম্লান করে দেয়।'

আজ বাসায় সবার আনন্দ রফিককে ঘিরে। ওর পুরষ্কারগুলো সাজিয়ে রাখা হয়েছে টেবিলে। রফিকের উল্লাসও কম নয়। কিন্তু পুরষ্কারগুলো সাজিয়ে রাখা হয়েছে টেবিলে। রফিকের উল্লাসও কম নয়। কিন্তু মাঝে মাঝে আলমের কথা মনে পড়তেই ওর মনটা ভারী হয়ে আসে। ভাবে কেন এমন হল। ওই তো আগে আমার সাথে কথা বলা বাদ দিল। আমি তো ওকে কোন ব্যথা দেইনি'

রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে রফিক কল্পনার জাল বোনে-আজ রাতে যদি স্বপ্নে দু'জনের দেখা হতো সকালে কথা বলতে আর সংকোচ ঠেকতো না।

www.pathagar.com

রফিকের আম্মা একদিন আলমের প্রসঙ্গ টেনে বললেন ঃ 'আলম সেকেন্ড হল, পুরষ্কার পেল ওকে একদিন দাওয়াত করল না রফিক।'

এই প্রথম রফিকের আম্মা ওদের সম্পর্কের কথাটা জানলেন। তাঁর মনটা বেশ ভারাক্রান্ত হল। আম্মু রফিককে মহানবী (সঃ) এর কথা শুনালেন। বললেন, "মুসলমান একে অপরের সঙ্গে তিন দিনের বেশি কথা না বলে থাকতে পারে না।" প্রিয় নবী রাসুল (সাঃ)-এর এই অমিয় বাণীটি রফিকের মনে দাগ কাটে ও সিদ্ধান্ত নেয়, আলমের সাথে কথা বলতেই হবে। রফিক অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করে, আলমের সাথে দেখা হলে সে প্রথম সালাম দিবে।

রফিকের আব্বার বদলীর অর্ডার হয়েছে। আগামীকাল ওদের অন্যত্র চলে যেতে হবে। বিদায়ের সব আয়োজন শেষ। আলম বিদায় জানাতে এসেছে বন্ধুকে। আলম রফিকের হাত ধরে এক অনাবিল ঘনিষ্ঠতায় দাঁড়িয়ে আছে। দীর্ঘদিনের কথা বলার বিরতির অবসান ঘটলেও আজ তারা দু'জনে কোন কথা বলতে পারছে না। শুধু নির্বাক চেয়ে আছে। একে একে সবাই গাড়িতে উঠে যায়। আম্মুর ডাকে রফিক গাড়ির দিকে পা বাড়ায়। রফিকের দু'চোখের কোণ ভিজে আসে। আম্মুকে দেখে 'ও' লজ্জা পায়। চোখের পানি লুকাতে চেষ্টা করে। গাড়ি ছেড়ে যায়। রফিক ভাঙ্গা গলায় বলে, আলম চিঠি দিস। ওর ক্ষীণ কণ্ঠ আলমের কানে পৌছায় না।

www.pathagar.com

প্রভাতফেরী

সে দিন প্রয়োজনীয় কাজগুলো গুছিয়ে নিতে অনেক রাত হয়ে যায়। এক সময় ঘুমিয়ে পড়ি। কখন যে সুবহে সাদিক হয়ে যায় বুঝতে পারিনি। বহু দূর থেকে প্রভাত ফেরির সুরলহরী ভেসে আসে- "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে বন্ধুরা ফেব্রুয়ারী ..... আমি কি ভূলিতে পারি ..... ।"

ঝটপট তৈরি হয়ে নিই। দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হয়। দেখি আমার স্কাউট ক'জন এসে হাজির।

-"এ্যই চল দেরী হয়ে গেল তো।" শহীদ মিনারে শৃংখলা রক্ষার মূল দায়িত্বটাই ছিল আমাদের উপর। সবাই যেন সুন্দরভাবে মিনার পর্যন্ত হেঁটে আসতে পারে, ফুল দিতে পারে স্বচ্ছন্দে আর সুশৃংখলভাবে নেমে যেতে পারে সে সবই সামলাতে হবে আমাদের। আমাদের সাথে সহযোগিতায় আরো থাকবে আনসার ও ভিডিপি'র সদস্যরা। লাল সবুজে মেশানো স্কার্ফটা মাথায় বেঁধে বন্ধুদের সাথে বেরিয়ে পড়ি।

আমাদের উপজেলা শহরের একপ্রান্তে অবস্থিত শহীদ মিনার। তিনটি স্তম্ভ শির উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। দেখলেই মনে পড়বে জাতীয় কবি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলের সেই উদাত্ত ঘোষণা- 'বল বীর বল চির উন্নত মম শীর ..... ।'

মিনারের গায়ে, সিমেন্টে খচিত বর্ণমালা জ্বল জ্বল করে। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে মনে হবে, গ্রামীণ এই শহরের কোন অতীত ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাস হয়ত গর্বের, অহংকারের, হয়ত বেদনার।

www.pathagar.com

মিছিলগুলো আসতে শুরু করে আঁধার থাকতেই। কুয়াশামাখা ভোর সামনে নিয়ে আমরা দাঁড়িয়ে থাকি। ফাগুনের দখিণা মৃদুমন্দ হাওয়া শিশু-কিশোরদের উদাসী চুল ছুঁয়ে যায় গানের সুরে ভোরের বাতাসটা ভারী হয়ে ওঠে। আমরা কান পেতে শুনি। সবার হাতে ফুল। আমরা এক এক করে এগিয়ে নিয়ে যাই। সিঁড়ি বেয়ে উঠে যায় শত শত মানুষ, খালি পায়ে নিঃশব্দে। ছোট্ট সাদা পরীর মতো মেয়েটির হাত ধরে এগিয়ে যাই মিনারের কাছে।

- রনি একটা চিঠি বারবার পড়ছে। ওর গ্রামের বন্ধু রফিক লিখেছে উল্লাপাড়া থেকে। ছোট বোন অনিকার দৃষ্টি এড়ায় না। ওরা পিঠাপিঠি। সারাক্ষণ একটা কিছু নিয়ে লেগেই থাকে।

কেউ কেউকে ছাড়া থাকতে পারে না। আবার এক সাথে থাকলে খুন্সুটির শেষ নেই। মা'র শাসন মানে না ওরা। বাবা অবশ্য ওদের হৈ-চৈ, মান- অভিমান বেশ উপভোগ করেন।

ঃ কি করছো ভাইয়া !

ঃ পড়ছি।

ঃ পড়ছো তো দেখছি। কি পড়ছো?

ঃ গুণীজনে বলেন, পড়ার কিছু না থাকলে, হাতের কাছের পঞ্জিকাটাই পড়। তাতেও জ্ঞান অর্জন হবে।

ঃ তুমি নিশ্চয়ই পঞ্জিকা পড়ছো না।

ঃ হু, এটাও এক ধরনের পঞ্জিকা; জীবনের পঞ্জিকা।

- অনি আর কথা বাড়ায় না। মনে মনে দস্যিপনাটা এঁটে নেয়।

নিরিবিলি সেই সময়টা এসে যায়। ভাইয়া এখন বাসায় নেই। এটাই মোক্ষম সময়। অনি ভাইয়ার রিডিং রুমে হানা দেয়। ভাইয়া সেদিন এত মনোযোগ দিয়ে কি পড়ছিল একটু দেখতে হবে। কিছু হলে ক্ষমা চেয়ে নেব। টেবিলে কয়েকটা বই এলোমেলো পড়ে আছে। অনি বইগুলো গুছাতে যায়। একটা বইয়ে ভাঁজে গোলাপী একটা খাম। 'ইউরেকা .....। এই চিঠিটাই ভাইয়া পড়ছিল, তাহলে .....।' ইতস্তত দুরু দুরু বুকে খাম খুলে ফেলে অনি। পড়তে শুরু করে।

রনি ! এখন জোছনা রাত। আকাশে তারার মেলা। আমাদের দোতলা বাড়ির ছাদে উঠলে শহীদ মিনার দেখা যায়। মিনার এখনো ফুলে ফুলে ঢাকা। দেখলে মনে হয় রাতের তারারা ফুলেল মিনারে রাশি রাশি আলো ঢেলে দিচ্ছে তোরা রাজধানীর মানুষ। জোছনা রাতে আকাশ দেখার সুযোগ হয়ত হয় না। তুই এখন থাকলে খুব মজা হতো। তোকে খুব মিস করছি। জানিস রনি ! সেদিনের একটা স্মৃতি মোটেই ভুলতে পারছি না। - বেলা বাড়তে থাকে ভোরের সোনামাখা হলুদ বরণ রোদে মিনারের অজস্র ফুল ঝলমল করতে থাকে। কণ্ঠস্বরগুলো থেমে আসে। ভিড় এখন হালকা। একজন খুনখুনে বৃদ্ধা একগোছা রজনীগন্ধা হাতে

www.pathagar.com

নিয়ে সিঁড়িতে পা রাখল। আমি এগিয়ে যেতেই বলল, বাবা আমাকে একটু ধর। উপরে নিয়ে চল। আমি বুড়িমাকে সাহায্য করলাম। সহপাঠী শফিকও এগিয়ে এল। বুড়িমা মিনারে ফুল রাখল সযতনে। তারপর দু'হাত উপরে তুলে হাউ মাউ করে কাঁদল। মিনারে ফুল অর্পণ করে এভাবে কাউকে কাঁদতে দেখিনি। নিচে নেমে এসে বুড়িমা আমার চোখে-মুখে হাত বুলিয়ে দেন। জিজ্ঞেস করলাম, আপনার কেউ নেই। বলল, "আছে, এ্যাইযে তুমরা। ভাইরে আমার একডা জোয়ান পোলা আছিল। অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করার জন্য সন্ত্রাসীরা তাকে মাইরা ফেলাইচে। আমি দোয়া করি, তুমরা অনেক বড় হও। তুমরা দ্যাশের সোনার পোলা।"

বুড়ির কথা থেমে যায়। চোখের পাতা থেকে নেমে আসে ক্ষীণ দুটি পানির ধারা।

ঃ একলা যেতে পারবেন?

ঃ হ, এহন পারুম। হেই রেল ইসটিশান থ্যাইকা একলা আইচি। প্রতিবার আহি, চিনা রাস্তা। তুমি অহন যাও ভাই .....।

বুড়ি ধীরে ধীরে হেঁটে হেঁটে চলতে শুরু করে। আমি শুধু চেয়ে থাকি বুড়ির গন্তব্যের দিকে।

আচ্ছা রনি বলতে পারিস, কবে আমাদের দেশটাতে শান্তি-স্বস্তি ফিরে আসবে। আমাদের মধ্যে সহনশীলতা, সহমর্মিতা নেই কেন? এখন তো আর বিদেশীরা আমাদের শাসন করে না। আমরা এখন স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক। আমাদের এখন ভাগ্য গড়ার সময়। তবে কেন এত হানাহানি, বোমাবাজি, হরতাল ! - অনি অন্য এক জগতে হারিয়ে যায়। চুরি করে ভাইয়ার বন্ধুর চিঠি পড়া যে অন্যায়, এ কথা আর খেয়াল নেই ওর। অনির চোখের পাতায় ছোট চাচুর স্মৃতি এসে ধরা দেয়। ওর ছোট চাচু শাহেদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী গণআন্দোলনের সময় শাহেদ পুলিশের গুলীতে জীবন দেন। তারপর রক্তের সিঁড়ি বেয়ে আসে গণতান্ত্রিক ধারা। একুশের সকালে অনি বাবা, মা ও ভাইয়াকে নিয়ে গিয়েছিল কেন্দ্রীয় শহদি মিনারে ফুল দিতে। ভোরে শিশিরসিক্ত পিচঢালা সড়কে হাঁটার শিহরণ জাগে অনির মধ্যে।

- "এই কালো পথ রক্তে রাঙিয়েই কি তার ছোট চাচু লুটিয়ে পড়েছিল।"

রনি ঘরে ঢোকে। পেছন দিক থেকে এসে বোনের কাঁধে হাত রাখে।

ঃ সরি ভাইয়া .....।

- রনি আঙ্গুল দিয়ে বোনের দু'চোখের পানি মুছে দেয়।

ঃ আর কান্না নয়। আমরা এখন অনেক দূর এগিয়ে গেছি। আর পেছনে ফেরা নয়। সুদূর সিয়েরালিয়নে বাংলা এখন অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পেয়েছে। জাতিসংঘ একুশে ফেব্রুয়ারী দিনটিকে বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস হিসেব ঘোষরা করেছে। বাংলাদেশ সব বাধা দলিয়ে এগিয়ে যাবেই যাবে।

- রনি বোনের মুষ্টিবদ্ধ হাত উঁচু করে ধরে।

www.pathagar.com

তুহিন

তুহিন এখন খুব খুশি। ও এখন আর একা নয়। ওর ছোট্ট একটা ভাইয়া আছে। নরম তুলতুলে। গোলাপের পাপড়ির মত। ওই আদর করে নাম রেখেছে ননী। ওর আব্বু আম্মুরও খুব পছন্দ দু'অক্ষরের এই নামটা।

তুহিন সারাদিন ব্যস্ত ভাইয়ার যত্নে। ভাইয়ার জন্য আম্মুর কোলের অধিকারও অনেকটা ছেড়ে দিয়েছে ও। দুপুরে আব্বু বাসায় এলে তুহিন শুরু করে ননীর গল্প "জান আব্বু! ননী কিনা কথা বলতে পারে; ও বাসার সবাইকে চেনে। কেমন টুলুটুলু চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে সবকিছু দ্যাখে। ননী আর একটু বড় হলে ওর জন্য একটা পুতুল কিনে দিতে হবে। আর একটা খেলনা।"

তুহিন, খুব জেদী মেয়ে। ও' যখন একা ছিল তখন একটা কিছু হলেই জুড়ে দিত কান্না। সে কান্না আর থামানো যেত না। এখন যে ও' মান-অভিমান, কান্না-কাটি করে না তা নয়। তবে এখন কান্নাকাটি শুরু করলে সহজেই চুপ করানো যায়। শুধু বলতে হয়- তুহি' চুপ করো, নইলে কিন্তু ননীকে পাশের বাড়ির বিল্টুদের দিয়ে আসা হবে।"- আর ওমনি তুহি'র কান্না শেষ।

সেদিন পুতুলের জন্য বায়না ধরেছে তুহি'। নদীর সাথে ও' পুতুল নিয়ে খেলবে। আব্বু পুতুল কিনে দেয়ার কথাও দিয়েছেন। কিন্তু রাতে আব্বু বাসায় ফিরলেও ভুল করে পুতুল নিয়ে আসা হয়নি?। তুহি'র কান্না দেখে কে ! কত সান্ত্বনা, কত আশ্বাস। কিন্তু কিছু হয়নি।

www.pathagar.com

অনেক রাত। তুহি'র দুচোখে ঘুম নেই। ও' ভেবে কিছু পাচ্ছে না। আকাশ পাড়ের এই নীল পরীরা কোত্থেকে এলো। পরনে রঙিন শাড়ি। হাতে ফুলের তোড়া। প্রজাপতির মত সাত রঙা পাখা। পরীরা যে, ওর ভাইয়া ননীকে ঘিরে বসে আছে। কেউ ননীকে আদর করছে। কেউ আঁখির কোণে কাজল এঁকে দিচ্ছে। কেউবা দোলা খাওয়াচ্ছে। তুহিকে পরীরা একটুও ডাকছে না। কাছেও যেতে দিচ্ছে না। কিন্তু ভাইয়া যে তার। ওরা ওমন করছে কেন? পরীদের ওপর ভীষণ রাগ হচ্ছে তুহি'র। ও' আম্মুর কাছে নালিশ করছে। কিন্তু আম্মুও কিছু বলছেন না। তুহি শুধু নীরবে কাঁদছে। আব্বুকে যে ডেকে বলবে কিন্তু তাঁকেও কোথাও দেখছে না।

ধীরে ধীরে রাত অনেক হচ্ছে। বাইরে নিস্তব্ধতা। নিঝুম। সাড়া শব্দও নেই। দূরে মাঝে মাঝে ঝি-ঝি পোকার একটানা শব্দ নিরবতা ভাঙছে। জানালা দিয়ে রাতের আকাশের চাঁদের আলো ঘরের ভেতর পরীদের গায়ে এসে পড়ছে। বাইরের ঝিরঝির বাতাসে থেমে থেমে হাসনাহেনার গন্ধ ভেসে আসছে। ননীকে নিয়ে নীল পরীদের আনন্দ উল্লাসও বেড়ে চলেছে। পরীরা কেউ ঘুমপাড়ানী গান গাইছে। কেউ পাখা দুলিয়ে নাচছে।

এক সময় পরীরা ননীকে পাখার ওপর তুলে নিতে চাইছে। এই বুঝি ওরা ননীকে নিয়ে পালিয়ে যাবে দূর আকাশে পরীর দেশে। তুহির বুকটা দুরু-দুরু করে কেঁপে ওঠে। ও জোরে চিৎকার করে আব্বুকে ডাকতে চায়। কিন্তু পারে না।

আম্মুর ডাকে তুহি' চোখ মেলে তাকায়। দেখে পাশে ননী হাত-পা নেড়ে-নেড়ে খেলছে। ভোরের মিষ্টি আলো ততক্ষণে ঘরের ভেতর প্রবেশ করেছে। পাখিরা কিচির- মিচির শব্দ তুলছে। তুহি' বিস্মিত। অধরে মিষ্টি হাসি। ননীকে আলতো করে চুমু খায় ও'।

www.pathagar.com

শাওনের গল্প লেখা

ছোট মামা গ্রাম থেকে এসেছেন। শাওন তাই বেশ ফুর্তিতে আছে। বিকেলে ক'জন বন্ধু এসে জোটে। অন্তু, রুমী ও পবন। ওরা পাশের ফ্লাটের। শাওন মাতিয়ে তোলে সবাইকে। মামা ড্রয়িং রুমে বসে বই পড়ছেন। মাঝে মধ্যে চশমার ফাঁকে বেলকনিতে ভাগ্নের অদ্ভুত ধরনের খেলাও দেখছেন। বইয়ের বিষয়-আশয়ের চেয়ে শাওনের খেলাটাই বেশি মনোযোগ কাড়ে মামার।

মামা শাহীন তারেক, স্কুল টিচার। নতুন জয়েন করেছেন। এডুকেশন সাইকোলজির উপর গ্রাজুয়েশন করেছেন তিনি। শিশু শিক্ষা মনস্তত্ত্ব বিষয়ে তার লেখালেখি আছে। তিনি ভাবছেন শাওনদের খেলাটা কি হতে পারে।

- "ছোট বেলায় আমরা চোর-পুলিশ খেলেছি। যে পুলিশ হতো, সে চোর খুঁজে বের করত। সে রকম কিছু মনে হচ্ছে না। তবে খেলাটা কি? ..... ছোট খাটো একটা জনসভার মতই মনে হচ্ছে। একজন বেশ উচ্চস্বরে বক্তৃতা করছে। বক্তা কথার চেয়ে হাত ছোঁড়াছুঁড়িই বেশি করছে। হঠাৎ হট্টগোল। ছোটাছুটি। শাওন কাগজের চার কোণা প্যাকেটের মত একটা বস্তু হাতে নিয়ে ছবি তোলার ভঙ্গিতে ক্লিক ক্লিক করছে।"

মামার আর বুঝতে বাকী থাকে না খেলাটি কি। মামা মিষ্টি মিষ্টি হাসেন। খুব উপভোগ করেন ওদের খেলা। শাওনরা ঢাকায় থাকে। ওর বাবা মাহবুব জামান একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। শাওনের মামা আসার খবর পেয়ে তিনি আজ একটু আগেই বাসায় ফিরেছেন। সন্ধ্যার পর ছোট মামাকে নিয়ে

www.pathagar.com

মেতেছে শাওন আর রূমকী। দু'ভাইবোন ওরা। রূমকী ছোট। কেজি স্কুলে প্লে গ্রুপে পড়ে। শাওন স্ট্যান্ডার্ড থ্রিতে এবার ফার্স্ট হয়েছে। মামা তাই শাওনকে একটি দামি কলম গিফট করেছেন। গল্পের আসরে আব্বু আম্মুও এসে যোগ দেন।

ঃ আম্মু এস আব্বু এস, মামা গল্প বলবেন- রূমকী এভাবেই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে। শাওন বলে মামা ! তোমার মোটর সাইকেল এক্সিডেন্টের গল্পটাই করো না।

শাহীন সাহেব দু'মাস আগে স্কুলে যাবার পথে মোটর সাইকেল এক্সিডেন্ট করেছিলেন। সুস্হ হবার পর এই প্রথম এসেছেন ভাগ্নে-ভাগ্নিদের দেখতে।

ঃ সেই গল্পটাই করো ভাইয়া। আমরা খুব টেনশন করেছি। আল্লাহর হাজার শুকরিয়া, তিনি তোমাকে সুস্থ করে তুলেছেন। শাওনের মা মেয়েকে কোলে নিয়ে বসে।

"সেদিন স্কুলে যাবার তাড়া ছিল। জেলা শিক্ষা অফিসার আসবেন স্কুল ভিজিটে। আমার স্কুলটা উপজেলা শহর থেকে মাইল পাঁচেক দূরে। গ্রামের স্কুল হলেও যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল। ইউনিয়ন সদর পর্যন্ত পাকা রাস্তা। মাঝে একটা ব্রিজ আছে। আমার মোটর সাইকেল ব্রিজে উঠতে যাবে, এমন সময় হঠাৎ একটি ছেলে রাস্তা পার হতে আড়াআড়ি দৌড় দেয়। তাকে বাঁচাতে ব্রেক করি। গাড়ীতে বেশ গতি ছিল। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্রিজ থেকে নীচে পড়ে যাই। এরপর আর কিছু মনে নেই। যখন জ্ঞান ফিরল, দেখি একটা জীর্ণ কুটিরের সামনে গ্রামের মেয়েরা কলসীতে করে আমার মাথায় পানি ঢালছে। একজন এক গ্লাস গরম দুধ নিয়ে এসেছে। বলতে গেলে ওদের সেবাযত্নে সুস্থ হয়ে উঠি। ব্রিজের নিচে কাঁদা পানি থাকায় আঘাতটা কম লেগেছিল। অবশ্য হাতের ব্যথাটা এখনো আছে।"

- একাত্তর সাথে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় গ্রামের মানুষরা এভাবেই আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবাশুশ্রূষা করত। আশ্রয় দিয়ে খাদ্য দিয়ে সাহায্য করত।

- শাওনের বাবা শহীদ মুক্তিযোদ্ধা বড় ভাইয়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন।

ঃ স্বাধীনতা যুদ্ধটা কেন হয়েছিল বাবা! শাওনের চোখে কৌতুহলের দীপ্তি ছড়ায়।

ঃ স্বাধীনতা মানে হল নিজেই নিজেকে চালানো। একে বলে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। আরো ভাল করে বলা যায়, অপরের অধিকার ক্ষুণ্ন না করে নিজের প্রাপ্য অধিকারগুলো স্বচ্ছন্দে ভোগ করা। স্বাধীনতা থাকলে মানুষ ও সমাজের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। এই অবস্থাটা আমাদের ছিল না। আমরা ছিলাম অন্যের অধীন। অর্থাৎ পরাধীন। আমরা দু'শ বছর পরাধীন ছিলাম। ইংরেজরা আমাদের শাসন করত। তখন এ উপমহাদেশে হিন্দু মুসলমানদের কোন অধিকার ছিল না।

www.pathagar.com

অনেক সংগ্রামের পর ১৯৪৭ সালে ইংরেজরা আমাদের স্বাধনিতা মেনে নেয়। গঠিত হয় হিন্দু মুসলমানদের পৃথক স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। ভারত ও পাকিস্তান। মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয় পাকিস্তান। পাকিস্তানের দু'টি অংশ ছিল, পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান। আজকের বাংলাদেশ ছিল এক সময় পূর্ব পাকিস্তান। তৎকালীন পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের অধিকার বঞ্চিত করে। নানাআবে নির্যাতন করে। ফলে এ অঞ্চলের মানুষ প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক শাসক এ দেশের মানুষের উপর সৈন্য বাহিনী লেলিয়ে দেয়। শুরু হয় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। এ যুদ্ধ ছিল পরাধীনতার হাত থেকে মুক্ত হবার যুদ্ধ। স্বাধীনতার যুদ্ধ। এই যুদ্ধে গিয়ে তোমাদের বড় চাচা শাহাদাৎ বরণ করেছিলেন। হাজারো রক্তের বিনিময়ে আমরা বিজয় লাভ করি। আজ আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক।

পরিবেশটা ভাবগম্ভীর হয়ে পড়ে। মামা একটু হালকা করতে শাওনকে বলেন, তুমি তখন সাংবাদিক সাংবাদিক খেলছিলে না?

ঃ জি মামা। কেমন করে বুঝলেন?

ঃ তোমার এ্যাকটিং দেখেই বুঝেছি।

আচ্ছা শাওন ! এই যে আমি আমার দুর্ঘটনার কাহিনীটা তোমাদের শুনালাম এটা তুমি লিখে প্রকাশ করতে পারবে?

ঃ নিশ্চয়ই পারব মামা।

ঃ তাহলে লিখে আমাকে দেখাবে কেমন!

এরপর বেশ ক'দিন কেটে গেছে। শাওন ছোট মামার এক্সিডেন্টের বর্ণনার উপর একটা স্টোরী লিখে ফেলে। কিন্তু মামা তো চলে গেছেন। কেমন করে দেখাবে। শাওন ভাবে মামাকে সারপ্রাইজ দিতে হবে। 'ও' লেখাটি একটি জাতীয় দৈনিকের শিশুদের পাতায় পাঠিয়ে দেয়।

বসন্তকাল। ভোরের মৃদু মন্দ হাওয়ায় ঘরের দরজার পর্দাটা দুলছে। শাহীন সাহেব চা'র টেবিলে ঝড় তুলে পত্রিকা পড়ছেন। তার আবার জোরে পড়ার অভ্যাস। টেলিভিশনে খবর পড়ার স্বপ্ন দেখতেন এক সময়। পাতা উল্টাতে গিয়ে শিশুদের বিভাগ পাতা বাহার-এ চোখ আটকে যায়। ছোট্ট একটি লেখা। শিরোনাম "মামার মোটর সাইকেল এক্সিডেন্ট" শাওন আহমেদ।' মামার বিস্ময় কাটে না। এতো তারই কাহিনী। ভাগ্নে সাবাস ! শাওন সোনা সত্যি তুমি বড় সাংবাদিক হবে। দেশ গড়বে।

www.pathagar.com

ঝন্টু

স্কুলের বেলা বয়ে যায়। নাঃ কোন রিকশা-টিকশার মুখ দেখা যচ্ছে না। সকাল থেকে বৃষ্টি আর বৃষ্টি। মাঝে একটু ধরেছিল। এখন আবার ঝুর-ঝুর করে নামতে শুরু করেছে।

"নীল নব ঘনে আষাঢ় গগনে
তিল ঠাই আর নাহিরে
ওগো আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে।"

আনমনে ভাবনার পর গুন-গুন করে সুর তোলে রফিক।

ঐতো একটা রিকশা এদিকেই আসছে। এ্যাই খালি এ্যই খালি ! যাবে মতিঝিল হাই স্কুল, মতিঝিল?

রাজধানী ঢাকা শহরে যাত্রীবিহীন কোন রিকশাকে খালি বলে ডাকার রেওয়াজ। রিকশাকে খালি বলে ডাকতে রফিকের কাছে আগে বেখাপ্পা লাগত। এখন অভ্যেস হয়ে গেছে। রিকশা পেয়ে রফিক হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। গোরান থেকে খিলগাঁও রেলগেট পর্যন্ত রাস্তায় খোঁড়াখুড়ি চলছে। গ্যাস লাইনের কাজ হচ্ছে। তাই রাস্তা খুব খারাপ। কর্দমাক্ত। মাঝে এক জায়গায় পানি জমেছে। রফিক বাসা থেকে বের হয়ে এতক্ষণ রিকশার জন্য অপেক্ষা করছিল।

www.pathagar.com

রিকশা ছুটে চলেছে। তখনো থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে। হঠাৎ রিকশার গতিটা থেমে আসে। প্রভাতিবাগের কাছে রাস্তার পাশে কয়েকটি ঝুপড়ি তোলা বস্তির সামনে এসে রিকশাওয়ালা ব্রেক কষে। ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং। রিকশাওয়ালা উঠতি বয়সের যুবক। রফিক কিছু বলতে যাবে। এমন সময় দেখে এক কিশোর বালক গামছায় বাঁধা পুটলির মত একটা কিছু নিয়ে আসছে। বস্তি ঘরের পাশে একটি কলা গাছ। গাঢ় সবুজ ছড়িয়ে তরতর করে বেড়ে উঠেছে। ছাউনির এক পাশে, পাতার ফাঁকে মধ্যবয়সী একজন মহিলা মাথায় ঘোমটা টেনে তাদের দিকেই এক দৃষ্টে চেয়ে আছেন।

রফিকের বুঝতে বাকি থাকে না। ওই মেয়েটি ওদের স্নেহময়ী মা।

ঃ পুটলিতে কি?

ঃ দুপুরের খাবার ভাইয়া গো।

আমাগো দুপুর যে কোথায় কোন খানে হয়, তার তো কোন ঠিক-ঠিকানা নাই। তাই মায়ে .....।

রিকশাওয়ালা পুটলিটা সীটের তলায় ঢুকিয়ে রাখে। রফিক ঠিক হয়ে বসে। রিকশা আবার ছুটে চলে। কিছুটা পথ এগুতেই রফিকের মনে হল, কিশোর ছেলেটি পিছু পিছু আসছে। কখনো রিকশার পেছনে লোহার বাম্ভরে ওপর উঠে দাঁড়াচ্ছে। রফিক ভাবে দুষ্টু ছেলেটি রিকশায় ঝুলে সুখ পেতে চায়। ও কিছু বলতে যাবে, এমন সময় চালক বলে, "ঝন্টু বাসায় যা, আজ আইতে হইব না। একাই পারুমনে।"

গতির মধ্যেই থমকে দাঁড়াল রফিক। ওর ধারণা তবে ভুল। চালক ওর অভিপ্রায় বুঝতে পেরেই বলে, "ও আমার ছোট ভাই। খিলগাঁ'র ঢালে ও একটু ঠেইলা দেয়। আমি বারণ করি তাও মানে না। মায়ের পেটের ভাইতো।"

সে দিন থেকেই ঝন্টু আর ওর বড়ভাই মনিরের সঙ্গে রফিকের পরিচয়। প্রতিদিন স্কুলে যাবার সময় মনির রিকশা নিয়ে হাজির হয় রফিকদের বাসার সামনে। ও প্রথমে খ্যাপটা দেয় রফিককে নিয়েই। এভাবে চলার পথে মনির ওদের সুখ-দুঃখের অনেক গল্পই শুনায় রফিককে।

নদী ভাঙ্গা মানুষ ওরা। জামালপুরের সরিষাবাড়িতে ওদের নিবাস ছিল। প্রায় এক যুগ আগে যমুনার করাল গ্রাসে মনিরদের বসত ভিটা, সামান্য জমি জিরাত নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। মনির তখন ছোট। ঝন্টুর জন্মই হয়নি। ওদের বাবা-মা সর্বস্ব হারিয়ে যমুনার বাঁধে এসে আশ্রয় নেয়। কাজ নেই, অন্ন নেই, এমন এক অবস্থায় মনিরের বাবা জমির শেখ জীবিকার তাগিদে ঢাকা শহরে পাড়ি জমায়। ঠাঁই নেয় কমলাপুর রেলওয়ে বস্তিতে। এর কয়েক বছর পর জমির

www.pathagar.com

শেখ অজানা এক রোগে প্রায় বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। ঝন্টুর তখন হাটি হাটি পা পা। একদিন সকালে এক দংগল পুলিশ আর লোকজন বস্তি ভেঙ্গে দেয়। সরকারী জায়গা অবৈধ দখলমুক্ত করে। মনির ছোট ভাই আর মাকে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে প্রভাতীবাগের এই বস্তিতে এসে মাথা গোঁজে। এভাবেই গল্প চলে রিকশার রিনঝিন শব্দের মাঝে। গল্পের যেন শেষ নেই।

আজকের সকালটা একটু অন্যরকম। মেঘমুক্ত আকাশ। মৃদুমন্দ হাওয়া। হয়ত শরৎ এসে গেছে। শরতের পর হেমন্ত তারপর শীতকাল। শীতের আগেই বার্ষিক পরীক্ষা হয়ে যাবে। তখন গ্রামের বাড়ি যাবার পালা। এমনি ভাবনার ফাঁকে সময় কেটে যায়। "না। মনির এখনো আসছে না। তবে কি .....।"

রফিক একটা রিকশায় চেপে বসে। প্রভাতীবাগের কাছে আসতেই দেখে বস্তিটা লন্ডভন্ড। যেন টর্নেডো বিধ্বস্ত কোন গ্রাম। না কোন ঘুর্ণিঝড় হয়নি। সিটি কর্পোরেশন অবৈধ বস্তি উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছে। রফিক উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করে। ওদের কাউকে দেখা যায় কি না। অনেক মানুষের ভিড়ে কিছুই ঠাওর করা যায় না। শুধু কলা গাছটার শত ছিন্ন পত্র পল্লব রফিকের মনে কষ্ট এনে দেয়।

আজ বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঝন্টুর কথা খুব করে মনে পড়ছে রফিকের। ও এতটুকু পিচ্চি হয়েও ভাইয়ের প্রতি কি দায়িত্ববোধ। ভাইয়ের কষ্ট লাঘব করতে ও ঢালে রিকশা ঠেলে দেয়। রিকশায় ঝুলে সুখ পাওয়ার কথা ভেবে সেদিন ওর কাছে নিজেকে খুব ছোট মনে হয়েছিল রফিকের। রফিকের জ্বর। সাত দিন পর জ্বরের প্রকোপ আজ কিছুটা কমেছে। এর মধ্যে মনির একদিন এসে দেখে গেছে। মনিরকে দেখে রফিক আশ্বস্ত হয়। না ওরা হারিয়ে যায়নি।

ঃ মা ! স্কুলের বন্ধুরা তো কেউ এল না।

ঃ কিভাবে আসবে বল। ওরা তো আর বাসা চেনে না বাবা।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হয়। ঝন্টু রফিকের কয়েকজন বন্ধুকে সাথে নিয়ে এসেছে। রফিক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে।

বন্ধুর কথা মনে পড়ল তাহলে!

- রফিক একবার বন্ধুদের দিকে তাকায়, আরকেবার ঝন্টুর দিকে।

রফিক বন্ধুদের কাছ থেকে রজনীগন্ধার একটা ডাটা নিয়ে ঝন্টুর হাতে তুলে দেয়।

www.pathagar.com

ফুল মেয়ে জরি

জরি একগুচ্ছ গোলাপ নিয়ে গাড়ীর ফাঁকে পা চালায়। জানালার কাঁচ খোলা পেলেই হাত বাড়ায়।

-"স্যার একটা ফুল ন্যান।" জরি কোন দাম হাঁকে না। সাহেবরা খুশি হয়ে যা দেন তাই নেয়। যানজটের সময় গাড়ি-ঘোড়ার সমুদ্রে এভাবে ঢুকে পড়লে যে কোন সময় বিপদ হতে পারে; সেদিকে ওর কোন খেয়াল নেই।

মগবাজার চৌরাস্তার মোড়ে প্রায়ই যানজট হয়। জরি বেশীরভাগ সময় এখানেই ফুল বেচে। ও একা নয়। ওর সমবয়সী আরো কয়েকটি মেয়ে ফুল বেচে। ছবি, নাসিমা, শেফালিকে ও চেনে। ওরা আসে কাওরান বাজার বস্তি থেকে। জরিরা থাকে মালিবাগ বস্তিতে। রোজ সকালে ওদের মা-বাবা কাজে বেরিয়ে গেলে ওরাও বেরিয়ে পড়ে। চলে যায় শাহবাগে। এখানে অনেকগুলো ফুলের দোকান আছে। এসব দোকানে ওরা ফুট-ফরমায়েস খাটে। ফুল ছাড়ানো, পানি ছিটানো- এমনি ছোটখাটো কাজ করে দেয়। বিনিময়ে পায় ফুল। সঙ্গে ওরা কিছু ভাল ফুলও অল্প দামে কিনে নেয়। তারপর ছোটে বিক্রির জন্য। মগবাজার, ইস্কাটন ছাড়িয়ে ওরা কখনো কখনো কাওরান বাজার পর্যন্ত যায়। শাহবাগ, রমনা পার্ক, পাবলিক লাইব্রেরী, বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চল ওদের ফুল বিক্রির জায়গা। বেলী রোড ধরে শান্তিনগর, মালিবাগেও ওদের যাতায়াত চলে।

জরির বয়স বার। পরনে খাটো সালোয়ার কামিজ। কি যে তার রঙ ছিল

www.pathagar.com

বোঝার উপায় নেই। ময়লা লেগে লেগে নষ্ট হয়ে গেছে। মাথায় কোঁকড়া চুল ঘাড় ছাপিয়ে গেছে। তেলের অভাবে চুল কটা। তারপরও ওর ভাসা ভাসা দু'চোখ একটা মায়া ছড়িয়ে থাকে। কেউ একবার দৃষ্টি তুলে তাকালে ফুল না নিয়ে পারে না।

হেমন্তের শেষেও ঢাকা শহরে তেমন একটা শীত পড়ে না। মেঘমুক্ত আকাশ। ফুরফুরে বাতাস। জরির কেমন যেন একটু শীত শীত করে। রাতে সম্ভবত এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে। জরির বেশ ভাল লাগে। বেলি ফুলের গন্ধ ওর মন ভরিয়ে দেয়। ও একবার নীল আকাশ দেখার চেষ্টা করে। বিশাল অট্টালিকাগুলো বাঁধ সাধে।

একটুখানি সবুজের জন্য ও আশ-পাশে তাকায়।

আইল্যান্ডের ইপিল-ইপিল গাছ আর দূরে ইতঃস্তত দু'একটা নারিকেল গাছের সবুজ পাতা ওকে হাতছানি দেয়। জরির গ্রামের কথা মনে পড়ে। এক নিমিষেই করতোয়ার পাড় দিয়ে ঘুরে আসে। হলদেপুর গ্রামের সোনাঝরা বিকেলগুলোর কথা ও ভুলতে পারে না। ছি-বুড়ি, গোল্লাছুটের দুরন্ত দৌড়গুলো ওর চোখের সামনে ছোটাছুটি করে। ট্রাফিকের বাঁশির কড়া শব্দে জরি সম্বিত ফিরে পায়। জরির মুখে কথার ফুলঝুরি ফোটে।

"একটা বেলী ফুলের মালা ন্যান স্যার। তাজা ফুল। সুনদোর ঘেরান।"

সুবারু গাড়ির স্বচ্ছ কাঁচের ফাঁকে এক বালক হাত বাড়ায়। জরি একগুচ্ছ বেলী ফুলের মালা তুলে দেয়।

ঃ কত দিতে হবে।

ঃ আপনার যা ইচ্ছা হয় দ্যান।

ঃ আমার কাছে তো খুচরো টাকা নেই; তাহলে তুমি এটা নাও। - সুজন ওর গেম সেটটা এগিয়ে দেয়।

ঃ হায় আল্লাহ! এটা নিয়া আমি কি করমু। থাক কিচ্ছু দিতে হইব না। ফুল আমি এমনি দিলাম।

ঃ এ্যই শোন ! তুমি আমাকে আপনি করে বলছো কেন। আমি তো তোমার ছোট হব।

ঃ হ- ঠিকই। তাইলে ছোট ভাইয়া .....। জরির ঠোঁটে একটা হাসির রেখা ফুটে ওঠে। সিগন্যাল বাতির দিকে তাকিয়ে ও দ্রুত পা বাড়ায় অন্য গাড়ির দিকে।

দুপুরে ঘরে পিরে জরির কাজে মন বসে না। ওর শুধু সুজনের কথা মনে পড়ে।

সুজনের মত ওর একটা ছোট ভাই ছিল- সেবার ভীষণ বন্যা। সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে গেল। জরিরা গিয়ে উঠল বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধে। কিছুদিন পর বন্যার

www.pathagar.com

পানি নেমে গেল ঠিকই। কিন্তু দুর্ভোগ আরো বাড়ল। খাবার পানি নেই, খাবার নেই, কাজ নেই, চারদিকে হাহাকার। অখাদ্য খেয়ে দেখা দিল ডায়রিয়া। সেই কালরোগে ওর পুতুলের মত ছোট ভাইটি সবাইকে ছেড়ে চলে গেল। তারপর ওরা দুঃখ নদী সাঁতরিয়ে ভেসে ভেসে পাড়ি জমালো ঢাকা শহরে। এসব ভাবতে ভাবতে জরির দু'চোখের কোণ ভিজে ওঠে।

মায়ের পায়ের আওয়াজ শোনা যায়। জরি ওড়নার আঁচল দিয়ে চোখ মোছে।

ঃ মায়ের মনটা আইজ ভার মনে হইতেছে। কেউ বকছে !

ঃ কই নাঃ। জান মা আইজ বড় লোকের এক ছেলে আমার কাছ থাইক্যা ফুল নিছে। ভাংতি টাকা নাই জন্যি আমারে যন্ত্রের মত একটা জিনিস দিতে নিছিল। আমি নেই নাই। ফুল এমনি দিয়া দিছি।

ঃ খুব ভাল করছোস মা। ছোট মানুষ খুব খুশি হইচে তাইনারে!

ঃ হ..... মা। আচ্ছা মা ওই জিনিসটা কি?

ঃ বড়লোকের শখের কত কি থাকে। হয় কোনো খেলনা-টেলনা হইব।

ঃ মা ওই ছেলেটা না আমাগো মানিকের মত দ্যাখতে।

- জরির মা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে মেয়েকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেন।

জরি ভাবে, আগামীকাল কি আবার ছোট ভাইয়ার সঙ্গে দেখা হবে। ওদের বাসা কোথায়? কোন স্কুলে পড়ে?

সুজনদের বাসা শেরে বাংলা নগরে মনিপুরী পাড়ায়। বাবা শিল্পপতি। সুজন গাড়িতে এ পথেই স্কুলে যাতায়াত করে।

সেদিন ফুলের দাম দিতে না পেরে সুজন নিজের ভেতর একটা তাগিদ অনুভব করে। ও ক'দিন হল মগবাজার মোড়ে এলেই খেয়াল করে সেই মেয়েটিকে দেখা যায় কিনা। কিন্তু না। ট্রাফিক সিগন্যাল না পড়ায় গাড়ি দ্র□ত চলে যায়। আবার কোনদিন সিগন্যাল পড়লেও ভিড়ে মেয়েটির দেখা পাওয়া ভার হয়ে ওঠে।

জরির মনও আনচান করছে, ছেলেটির দেখা পেতে। জরি ভাবে প্রতিদিনই ও এপথে আসতে যাবে কেন? শুধু শুধুই খুঁজছি।

সিগন্যালে লাল বাতি জ্বলে ওঠে। জরি একমুঠো রজনীগন্ধার ডাটা নিয়ে ঢুকে পড়ে যানবাহনের ভীড়ে। মৃদু স্বরে হাঁকে,

"স্যার ফুল ন্যান। একটা রজনীগন্ধার ডাটা।" দূর থেকে একটা অস্পষ্ট কণ্ঠ ভেসে আসে- "এ্যাই ফুল এ্যাই মেয়ে .....

www.pathagar.com

জরি দৃষ্টি মেলে। এদিক ওদিক তাকায়। হ্যাঁ ওই তো সেই ছেলেটি। ও দ্রুত ছুটে যায়। হয়ত এক্ষুণি সবুজ বাতি জ্বলে উঠবে। জরি একগুচ্ছ রজনীগন্ধা সুজনের হাতে তুলে দেয়।

ঃ কেমন আছো ভাইয়া।

ঃ ভাল। তুমি ভাল।

ঃ হ।

- সুজন দশ টাকার একটা কড়কড়ে নোট জরির দিকে এগিয়ে দেয়।

ঃ টাকা দিতে হইব না। তুমি এমনি নাও।

ঃ তা হয় না। আম্মু তোমাকে টাকা দিতে বলেছেন।

ঃ তুমি খুব ভাল ছোট ভাইয়া।

আবার একটার পর একটা গাড়ি চলতে থাকে। জীবন থেমে নেই। ছুটছে তো ছুটছেই। জরি আইল্যান্ডে এসে দাঁড়ায়। আগের মত গাড়ির কালো ধোঁয়ায় দম আটকানো অবস্থা আর নেই। চোখও ঝাঁজ করে না। সরকার টু-স্ট্রোক থ্রি হুইলার চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে। রাস্তায় নেমেছে সিএনজি চালিত গাড়ি। এতে ঢাকা শহরের পরিবেশের অনেকটা উন্নতি হয়েছে। জরি অবশ্য এ সবের কোন খবর রাখে না। এভাবেই মাঝে মধ্যে জরির সঙ্গে সুজনের দেখা হয়ে যায়। ফুল পেয়ে সুজন খুশি হয়। জরি কোন দিন দাম নেয়, কোন দিন নেয় না।

শীতটা ক্রমেই পড়তে শুরু করেছে। সন্ধ্যা নামার পরপরই মালিবাগ রেলগেটের বস্তিতে প্রাণের সঞ্চার হয়। এ সময় কাজ থেকে সবাই ঘরে ফেরে। কুয়াশায় ঢাকা বস্তির ওপর সোডিয়াম বাতির আলো এসে পড়ে। আলো আঁধারীতে বস্তির মানুষের জীবনের গল্প যেন জমে ওঠে। তারপর এক সময় চারদিকের কোলাহল থেমে যায়। একটা নিস্তব্ধতা নেমে আসে।

ঘুমের ঘোরে জরি অস্ফুট চিৎকার করে ওঠে। মা পাশ ফেরেন। জরিকে বুকে টেনে নেন। 'আয়াতুল কুরছি' পড়ে মেয়ের বুকে ফুঁ দেন। মা'র চোখে আর ঘুম আসে না। অনেক সাত -পাঁচ ভাবেন। মেয়েকে আর ফুল বেচতে পাঠাবেন না। আজকাল কত অঘটনই না ঘটছে। জরির বাপের শরীরটাও ভাল যাচ্ছে না। কি করবেন ভেবে পান না।

অনেকদিন হল জরিকে দেখে না সুজন। - "মেয়েটা গেল কোথায়। ফুল বিক্রি ছেড়ে দিল নাকি! ওর নামটাও জানা হল না।"

www.pathagar.com

- মগবাজার মোড়ে এলেই সুজন ভাবে। এদিক ওদিক উঁকি-ঝুকি দেয়। কিন্তু দেখা মেলে না। ও ড্রাইভার ভাইয়াকে জিজ্ঞেস করেও কোন সদুত্তর পায় না।

আজ পড়ার টেবিলে বসে সুজনের মন বসছে না। একটা বইয়ের পাতা উল্টাতে গিয়ে পৃষ্ঠার ভাঁজে একটি গোলাপের পাঁপড়ি দেখতে পায়। শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে। সুজন পাঁপড়িটি হাতে নিয়ে দেখে। ঘ্রাণ নেয়। আম্মুকে রুমে আসতে দেখে জিজ্ঞেস করে, "আম্মু, আমি যে মেয়েটির কাছ থেকে ফুল নিতাম সেই মেয়েটিকে আর দেখি না, ওর কি হয়েছে।"

মা লক্ষ্য করেন, ছেলে বোকার মত প্রশ্ন করছে। একটু সময় নিয়ে বলেন, "কি আর হবে। ওদের জীবনের কোন মায়া আছে; যেভাবে গাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়! হয়ত কোন অসুখ-বিসুখ করেছে।"

সুজনের বুকের ভেতর ছ্যাঁৎ করে ওঠে। তা হলে কোন দু ... র্ঘ....ট.... না। না তা হবে কেন। অসুখই হয়েছে। সুজন তার মনকে এআবেই সান্ত্বনা দেয়।

বাবা-মায়ের পক্ষে জরিকে বেশী দিন হাসপাতালে রাখা সম্ভব হয়নি। মেয়েকে বাসায় নিয়ে এসেছেন। ডাক্তার বলেছেন, একমাস পর পায়ের ব্যান্ডেজ কাটতে হবে। তবে জরি আর স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে পারবে না। জরি বস্তির জীর্ণ কুটিরে শুয়ে শুয়ে রাজ্যের সব ভাবনা ভাবে। বাবাকে জিজ্ঞেস করে, "বাজান! আমার পা কি আর ভাল হইবো না। আমি কি আর হাঁটতে পারুম না। বাজান, থানায় গেছিলে? পুলিশে কি কইল। গাড়ির মালিক কি টাকা পয়সা দিবো?

- জরির বাবা মেয়ের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন। মেয়েকে মিথ্যা সান্ত্বনা দিতে তার মন চায় না। জরি ভাবে, ছোট ভাইয়া কি জানে? যদি জানতো, তাহলে গাড়ি চালিয়ে আমাকে দেখতে আসত?

প্রতিদিনের মত আজো মগবাজার চৌরাস্তার মোড়ে বিশাল জ্যাম সৃষ্টি হয়েছে। জরি ক্র্যাচে ভর দিয়ে খট খট শব্দ তুলে গাড়ি ঘোড়ার ভীড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে। শব্দের ঝংকার তোলে, "একটা ফুল ন্যান স্যার। একটা ফুল ..... শীতের ফুল। সহসা সুজনের দৃষ্টি কাড়ে জরি। সুজনের বিশ্বাস হতে চায় না। এই সেই মেয়ে। সুজন হাত নেড়ে চিৎকার করতে থাকে, এ্যাই মেয়ে, এ্যাই মেয়ে তোমার একি .....! ততক্ষণে গাড়ি ছেড়ে দেয়। গাড়ির গতি দ্রুত বাড়তে থাকে।

www.pathagar.com

চিঠি

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হয়।

কলিং বেলটা বুঝি কাজ করছে না। মৌমিতা বেলকনিতে এসে দাঁড়ায়। নিচ থেকে পরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

ঃ ভাল খবর আছে আপামণি; শিগগির এসো।

ঃ কার চিঠি ভাইয়া?

ঃ তোমার চিঠি, তোমার।

- মৌ বিস্মিত হয়। আমার চিঠি! ওর আনন্দ আর ধরে না।

ঃ কি বিশ্বাস হচ্ছে না। তুমি না বলেছিলে, তোমার চিঠি আসবে-হাওয়ায় দুলে দুলে, পায়রার পেখম মেলে। আমিও পেখম মেলে উড়ে এসেছি, তোমায় চিঠি দিতে; এই নাও।

ডাকহরকরা মতি মিয়া একটা অব্যক্ত সুখ অনুভব করে, একটা রঙিন খাম মৌ'র হাতে তুলে দিতে পেরে। কেন এ আনন্দ, কিসের এ সুখানুভূতি, এর কোন ব্যাখ্যা তার জানা নেই। সে শুধু জানে প্রজাপতির সাত রঙা ডানায় ভর করে এ রকম আরো চিঠি আসুক হাজারো মৌ'র নামে।

এই তল্লাটে শিশু, যুবা, বৃদ্ধ সবাই তাকে মতি ভাই বলে জানে। এতে তার কোন অনুযোগ নেই। ঘরে ঘরে সুখ-দুঃখের বার্তা পৌঁছে দিয়ে সে যেন সবার পড়শী ভাই হয়ে গেছে।

স্কুল ছুটির দিন মৌ খুব নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। বাবা মা সবাই বেরিয়ে পড়ে অফিসের উদ্দেশ্যে। বুয়াকে জ্বালাতন করে, পুতুল খেলে কখনো কম্পিউটারে রঙের

www.pathagar.com

আলপনা একে সময় কাটে ওর। আজ হরতালের জন্য স্কুলে যাওয়া হয়নি। হরতাল কারো পছন্দ নয়। তারপরও কেন যে হরতাল হয় ! ঠিক বুঝে উঠতে পারে না মৌ।

যারা ক্ষমতায় থাকতে বলেছিল বিরোধী দলে গেলেও হরতাল ডাকবে না, তারাই এখন আবার ক্ষমতার বাইরে থেকে দিব্যি হরতালের কর্মসূচী দিচ্ছে। এই যে কথা না রাখার ব্যাপারটি মৌ'র কাছে খুব খারাপ লাগে। ও বাবাকে বলেন, আব্বু! বিরোধী দল কথা রাখলো না কেন?

- বাবা হাসেন। বলেন, এভাবেই সব ঠিক হয়ে যাবে মা। একদিন শান্তি ফিরে আসবে। আমরা সবাই সুশীল হয়ে উঠবো। মৌ 'সুশীল' শব্দটির অর্থ জিজ্ঞেস করে।

- বাবা আবারো মিষ্টি করে হাসেন। মৌ তখন বাবার হাসির অর্থ খুঁজে ফেরে।

অরথী'র চিঠি পেয়ে আজকের সকালটা খুব মনোহর হয়ে উঠেছে মৌর কাছে। ও বারবার চিঠিটি খুলছে আর পড়ছে। জীবনে প্রথম চিঠি পাবার আনন্দ যেন ফুরোয় না। এর মধ্যে একবার করে বাবা মাকে টেলিফোনে জানানো হয়ে গেছে পেন ফ্রেন্ডের চিঠির কথা।

মৌ পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। ওর অনেক দিনের সখ একজন কলম বন্ধু পাতানোর। মৌ তাই খবরের কাগজে পেন ফ্রেন্ডস কলামে ঠিকানা পাঠিয়েছিল। সত্যি সত্যি যে এভাবে একজন কলম বন্ধু পেয়ে যাবে ভাবতে পারেনি সে। তাও আবার সিয়েরালিয়ন থেকে। মৌ খুশীতে আটখানা।

অরথী ভাঙ্গা ইংরেজীতে লিখেছে, মৌমিতা। তোমরা খুব সুখী। ভাষার জন্য তোমরা গর্বিত। তোমাদের ভাষার ইতিহাস আমরা স্কুলের শিক্ষকদের কাছ থেকে জেনেছি, সত্যিই ভাষার জন্য তোমাদের ত্যাগ বড় বেদনার, বড় গৌরবের। তোমাদের দেশের সেনা সদস্যরা জাতিসংঘের শান্তি মিশনের সদস্য হিসেবে আমাদের দেশ পুনর্গঠনে, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছে। আর সে কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ আমাদের দেশের সরকার বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিয়েছে। তুমি নিশ্চয়ই সে কথা জেনে থাকবে।

বাংলাদেশের সেনা সদস্যদের প্রতিষ্ঠিত একটি স্কুলে আমি লেখাপড়া করি। আমরা আরো জানতে পেরেছি জাতিসংঘ ২১শে ফেব্রুয়ারী দিনটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে।

আমরা আমাদের দেশে এ বছর একুশে ফেব্রুয়ারী দিনটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করেছি। ওই দিন আমরা স্কুলে নাচ-গান করেছি। পতাকা উড়িয়েছি। স্মৃতি সৌধে ফুল অর্পণ করেছি ও কবিতা পাঠের আসরে অংশ নিয়েছি।

- বুয়াও ব্যাপারটা বুঝতে পারে।

ঃ কার চিঠি আপা।

www.pathagar.com

ঃ আমার চিঠি। ভিন দেশী এক রাজকন্যা লিখেছে।

ঃ হ-অ বুচছি হেই লাইগ্যা এত্ত আনন্দ মনে আপামণির।

চিঠির উত্তর লিখতে হবে। অরথী লিখেছে, প্রিয় বান্ধবী। আমি লিখব সুপ্রিয় অরথী। কেমন হবে। ওকে প্রভাত ফেরির কথা লিখব। লিখব সোনার বাংলার কথা। আমার চিঠি আব্বু আম্মু কাউকে দেখাব না। খুব লজ্জা লাগবে তাহলে। আব্বুকে বলবো, একুশের স্মারক ডাক টিকেট আর রঙিন একটি খাম এনে দিতে।

- এমনি ভাবনার মধ্যে মৌ'র সময় কেটে যায় আনন্দে- আহলাদে। মৌ পত্রের উত্তর লিখেছে। সুদৃশ্য খামের উপর সিয়েরালিওন ও বাংলাদেশ নামটা জ্বল জ্বল করছে। পোস্ট করার জন্য চিঠিটা আব্বুর হাতেই দিতে চেয়েছিল ও। পরে আর দেয়নি। ভেবেছে, আব্বু ব্যস্ততার কারণে যদি ভুলে যান। মৌ মতি ভাইয়ার জন্য অপেক্ষা করে। সে প্রায়ই এদিকটায় আসে।

ঃ ভাইয়া এতদিন পর এলে। অপেক্ষা করছি তো। চিঠি পোস্ট করবো।

ঃ আমি তো প্রায়ই আসি। তোমাদের কোন চিঠি না থাকায় .....। আজ ভাবলাম, একটু দেখা করে যাই। বেশ তো দাও আমি পোস্ট করে দিব।

ঃ ভাইয়া, তোমাকে আজ খুব খুশি মনে হচ্ছে।

ঃ আজ যে আমিও তোমার মতো চিঠি পেয়েছি। তাই খুব খুশি লাগছে।

ঃ কে লিখেছে?

ঃ কেন, আমার মেয়ে ফুল।

ঃ কি করে 'ও'?

ঃ তোমার মতই স্কুলে পড়ে।

ঃ দেখি তোমার মেয়ের চিঠি।

- মতি মিয়া চিঠিটা মৌ'র হাতে দেয়।

ঃ না, অন্যের চিঠি পড়া ঠিক হবে না। এমনি একটু দেখি। খুব সুন্দর তো হাতের লেখা। তা কি লিখেছে ফুল পাখিটি।

- মৌ ফুলের নামের সঙ্গে পাখি কথাটি জুড়ে দেয়ায় খুব খুশি হয় মতি মিয়া। বলে, কত কি লিখেছে। বাড়ী যেতে বলেছে। পুতির মালা চেয়েছে। রঙিন ফিতা রিবন লাগবে বলেছে। আমাকে ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া করতে বলেছে।

ঃ তোমার মেয়েটা না খুব ভাল। ওকে লেস ফিতা কিনে দিতে ভুলনা কিন্তু।

- মতি মিয়া ঝর্ণার মত উচ্ছল হেসে হেসে আবার কর্তব্য কাজে ছুটে চলে। এক সময় দিগন্তের সীমাহীন রেখায় হারিয়ে যায়। মৌ শুধু তার পথ পানে চেয়ে থাকে, আর ভাবে ফুলের কথা, অরথীর কথা।

www.pathagar.com

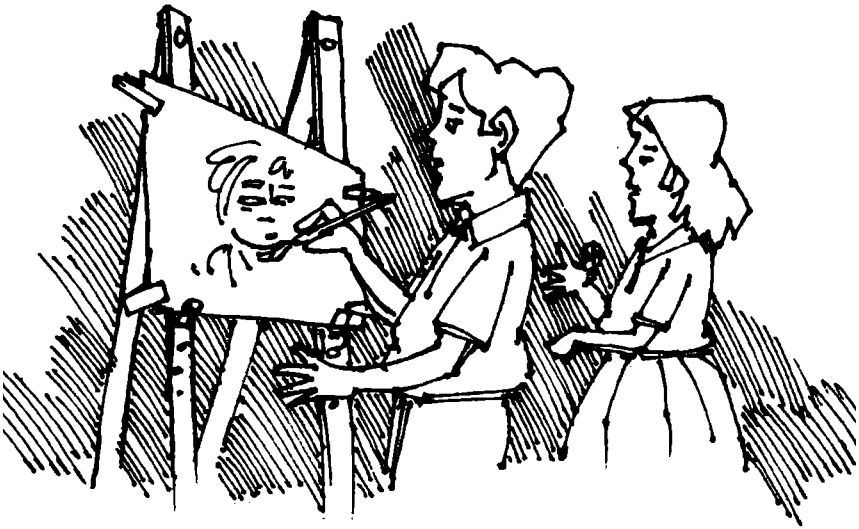

সেই ছেলেটি

ক্যানভাসে রঙ তুলির অজস্র আঁচড় দিয়ে চলেছে সুহান। নিবিষ্ট মনে ছবি আঁকছে ও। কার ছবি। কি আঁকছে ও। ছোট বোন মিলির কৌতূহল জাগে।

ঃ কি আঁকছ ভাইয়া; কার ছবি?

ঃ সেই ছেলেটির।

ঃ কোন ছেলেটির।

ঃ ওই যে সেই ছেলেটির।

ঃ এত ওই যে ওই যে করছ কেন?

ঃ আঁকা হলে ঠিকই বুঝতে পারবি।

ঃ তোমার এতসব রঙের খেলা আমি কিছুই বুঝি না। ভাইয়া! চোখে এত আলো দিলে কেন?

- সুহান মিলির আর কোন প্রশ্নের উত্তর দেয় না। ও দিক থেকে আম্মুর ডাক পড়ে 'মিলি, সুহান তোমরা এস টেবিলে নাস্তা দেয়া হয়েছে।

ঃ ভাইয়া চল, আম্মু ডাকছেন।

- সুহান কোন সাড়া দেয় না। বৈকালিক চায়ের আসরে যোগ দেয় মিলি। সুহান এঁকেই চলেছে। ওর সবটুকু মনোযোগ যেন রঙ তুলিতে।

কয়েকটা দিন ওদের দু'ভাই-বোনের বেশ আমোদেই কেটেছে। গ্রাম থেকে কাজিনরা এসেছিল। বড় চাচার ছেলে নাঈম ও মেয়ে সাবিহা। চাচাতো ভাইবোনকে ঢাকা শহর ঘুরিয়ে দেখিয়েছে ওরা। জাদুঘর, শিশুপার্ক, চিড়িয়াখানা,

www.pathagar.com

বলধা গার্ডেন, লালবাগের কেল্লা, আহসান মঞ্জিল-দর্শনীয় সব স্থানগুলো ঘুরে ঘুরে দেখেছে ওরা। যে দিন বেরুনো হয়নি, সেদিন হৈ-হুল্লা করে টিভি দেখে, গান গেয়ে, ছবি এঁকে বেশ কেটেছে ওদের। সুহান ভাল ছবি আঁকে। এবার বিশ্ব পরিবেশ দিবসে স্কুল ছাত্রদের ছবি আঁকা প্রতিযোগিতায় সুহান পুরস্কার পেয়েছে। কাজিনদের পুরস্কার দেখিয়ে গর্ববোধ করে সুহান।

ক'দিন হল কাজিনরা চলে গেছে। ফাঁকা ফাঁকা লাগছে বাড়িটা। এখন শুধুই স্মৃতি। সেদিন ছিল ছুটির দিন। স্কুল নেই। বিস্তর অবসর। গ্রীষ্মের কাঠফাটা রোদে বাইরে বেরুবার উপায় ছিল না। ঘরেই জমেছিল আড্ডা। দুপুরে এক পশলা বৃষ্টি হওয়ায় গরমটা বেশ পড়ে গিয়েছিল। সিদ্ধান্ত হল সবাই মিলে শিশুপার্কে যাবে। ঝটপট সব তৈরি হয়ে নেয়। আব্বু-আম্মুও সঙ্গে যাচ্ছেন। অনেকদিন আব্বুর সঙ্গে বেরুনো হয় না ওদের। তাই বেশি খুশি লাগছে মিলির। ওরা একটা ট্যাক্সি ক্যাব নিয়ে নেয়। ট্যাক্সি ক্যাবগুলো টাউন সার্ভিস হিসেবে নতুন। মিটার হিসেবে ভাড়া নেয়। বেতার ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা আছে এতে। বনেদী একটা ভাব যেন। নাঈম ওসাবিহার খুব ভাল লাগে। ট্যাক্সি ছুটে চলে। আইল্যান্ডে লাগানো সারিসারি গাছগুলো বেশ সবুজ হয়ে উঠেছে। ইট-পাথরের সড়কে সবুজের সমারোহ সাবিহাকে আনন্দ দেয়। দেখতে দেখতে গাড়ি শাহবাগে এসে পৌঁছে। শিশু পার্কের গেটে বেশ ভিড়। শুক্রবার হওয়ায় ভিড়টা একটু বেশি।

মুক্ত বিহঙ্গের মত ছুটে বেড়ায় ওরা। রঙ-বেরঙের বিভিন্ন উপকরণ দেখে, ঘুরে বেড়িয়েই ওরা আনন্দ পায় বেশি। তারপরও ওরা সবাই মিলে ট্রেনে ভ্রমণ করে। উড়োজাহাজে ওঠে। মটরগাড়ি চালায়। দোলনায় দোল খায়। শেষে আইসক্রীম খেয়ে বিকেলটা বেশ কেটে যায়। এখনো কয়েকটি টিকেট অব্যবহৃত রয়ে গেছে। ভিড় ঠেলে লম্বা লাইনে দাঁড়াতে উৎসাহ পায় না কেউ।

সন্ধ্যা নামছে। চারদিকে সোডিয়াম বাতি জ্বলে উঠছে। এবার ঘরে ফেরার পালা। সবাই উঠে দাঁড়ায়। গেটের কাছে আসতেই প্রায় বিবস্ত্র মলিন এক কিশোর হাত বাড়ায় "স্যার একটা টিকিট কেনার পয়সা দ্যান! নাগরদোলায় উঠুম!!"

পাশ থেকে ভদ্র গোছের একজন বলে ওঠেন, "এই ছোরা ঢুকেছিস ক্যান। তোদের জন্য তো সপ্তাহে একদিন ফ্রি।"

নাম না জানা কিশোরটি সুহানের দৃষ্টি কাড়ে। ও ভাবে ছেলেটি হয়ত প্রবেশ টিকেটের পয়সা যোগাড় করতে পেরেছিল। সুহান ওদের বেঁচে যাওয়া দু'টি টিকেট ছেলেটির হাতে তুলে দেয়। ছেলেটি যারপরনাই খুশি হয়। ওর দু'চোখ আলোয় আলোয় ভরে যায়। ছেলেটি টিকেট নিয়ে ওর স্বপ্নের নাগরদোলার দিকে ছোটে। সুহান পিছন ফিরে ছেলেটির দিকে চেয়ে থাকে; আর একটা অব্যক্ত সুখ অনুভব করে।

www.pathagar.com

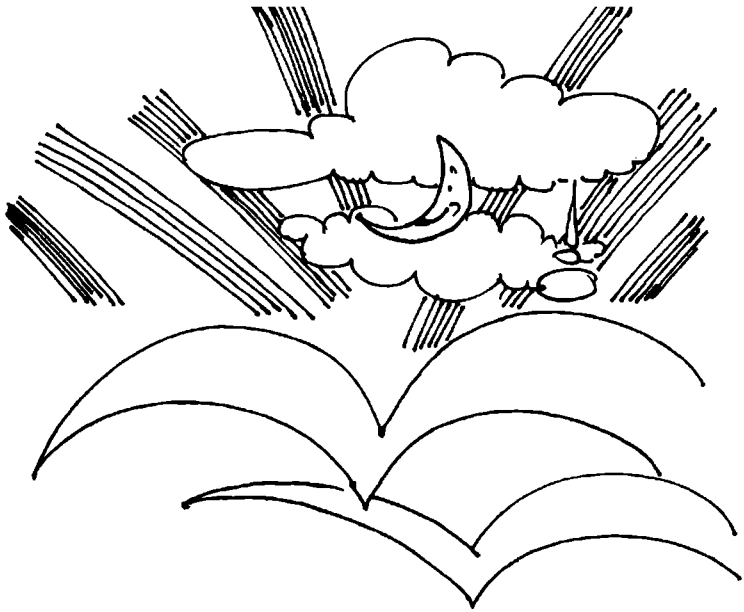

হাসে বাঁকা চাঁদ

এত আবেগ এত আনন্দ এত উচ্ছ্বাস আর কখনো দেখিনি। এখানে সেখানে ছেলে-মেয়েরা জটলা করছে। হেমন্তের শেষ বিকেলে প্রকান্ড সূর্যটা মেঘের আড়ালে লুকোচুরি খেলতে খেলতে পশ্চিমে ঢলে পড়ছে। অস্তগামী সূর্যের রক্তিম আভায় আকাশ বিচিত্র হয়ে উঠেছে।

মেঘের পর মেঘ রঙের আবির মেখে যেন ছুটে চলেছে। লাল নীল আকাশটা যেন ছেলেমেয়েদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। দিগন্ত জোড়া মাঠে শিশুদের সাথে সাথে বড়রাও নেমে এসেছেন। সবার দৃষ্টি পশ্চিমাকাশে। আজ ঈদের চাঁদ উঠবে। ঈদের একফালি বাঁকা চাঁদকে হাসি ঠোঁটে স্বাগত জানাবে সবাই, 'আহলান-সাহলান ঈদ মোবারক-ঈদ মোবারক' বলে।

ঈদের চাঁদ দেখার এত আয়োজনে, প্রকৃতির বর্ণাঢ্য মেলায় কখন যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি বুঝতেই পারি নি। অজানা-অচেনা ছেলে-মেয়েদের ভীড়ে এক সময় নিজেকে আবিষ্কার করি। খুব ভাল লাগে। ওরা না জানি আমার কত আপন, চির চেনা।

ঢাকা শহর দালান-কোঠায় ঢাকা। আকাশ দেখা, খোলা মাঠে বেড়ানো সে তো অনেক কিছু। এক সময়ের মুক্ত মাঠ-ঘাট জলাশয় এখন নগর জীবনের কোলাহল আর ঘিঞ্জিতে পরিপূর্ণ। শুধু সোডিয়াম বাতির আলোর ঝলকানি। তারা ভরা

www.pathagar.com

আকাশ, জ্যোৎস্না রাত এখানে স্বপ্নপুরীর রূপ কথা। আর ঈদের চাঁদ দেখা? সেতো টেলিভিশনের পর্দায় চোখ মেলা। আজ কিন্তু আমার সেরকম মনে হচ্ছে না। আমি যেন বাস্তবে দাঁড়িয়ে আছি। খুব কাছাকাছি। হেমন্তের মেঘমুক্ত স্বচ্ছ আকাশ। কখনো সাদা মেঘের ভেলায় রাজ্যি পাড়ি দেয়া। বালিহাঁসের উড়ে যাওয়া। গাং চিলের ঘরে ফেরা। দিগন্তে বাতাসের কলতান। এ সবই যেন ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখছি। একটু দূরে ছেলে-মেয়েরা হৈ-চৈ করে ওঠে। "ঐ যে ওই দ্যাহা যায়, ঈদের নয়া চাঁদ ! কাঁচির ফালির লাহান, ক্যামুন চিকোন।" শিশুরা গাইছে "রমজানের ঐ রোজার শেষে এল খুশির ঈদ।" অনেকেই হাত তুলে পশ্চিমাকাশে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। তখনো আমার চোখে পড়েনি। আমার দু'চোখ আকাশে খুঁজে ফিরছে।

ঃ ভাইজান! আপনি মনে হয়, এ্যহোনও দ্যাহেন নাই। আমার আঙ্গুলের দিক তাক করেন। ঐ যে সাদা মেঘডার ফাঁহে দ্যাহা যাইতেছে।

ঃ হ্যাঁ দেখেছি। আমার দু'চোখ আলোয় আলোয় ভরে ওঠে। বাঁকা এক ফালি চাঁদে এত আলো বুঝি আর কখনো দেখি নি। ঈদ মোবারক!!

ছেলেটি তখনো পাশে দাঁড়িয়ে।

আপনি মনে হয় বড় বাড়ির ছেলে। গ্রামের ঈদ বারবার আইছেন। আমার নাম হাসু।

-হাসু মিষ্টি করে হাসে।

ঃ আমি আনু। তোমাকে আমার খুব ভাল লেগেছে।

তুমি পড় বুঝি?

ঃ হ' কেলাস ফাইভে পাস দিছি। হাই স্কুলেও ভর্তি হইছি। তয় সবদিন স্কুলে যাওয়া হয় না। বাপজানের সাথে ক্ষ্যাতে কাজে যাইতে হয়।

ঃ কাজের ফাঁকে ফাঁকে পড়াশুনা চালিয়ে যাবে।

ঃ আপনি কি পড়েন।

ঃ ক্লাস সেভেনে পড়ি।

ঃ আমার এক ক্লাস ক্ষতি গ্যাছে। নইলে আমিও এইবার সেভেনে পড়তাম।

ঃ হাসু তোমাকে ঈদ মোবারক। কাল ঈদের মাঠে দেখা হবে। আমাদের বাড়ি এসো। তোমার বন্ধুদেরও নিয়ে এসো।

ঃ আইছ্যা।

গ্রামে মসজিদ থেকে মাগরিবের আজান ভেসে আসছে। অনেক দিন মাইক ছাড়া আজান শোনা হয় না। দরাজ গলায় আজান। যেন প্রকৃতির মত নির্ঝর। শুধু

www.pathagar.com

কান পেতে শুনতে ইচ্ছে করে। দূরে আনন্দ কোলাহল।

বেশ কয়েক বছর পর আমরা এসেছি গ্রামে ঈদ করতে। আমার ছোট বোন সাবা, ওর আগ্রহটাই বেশি। ওর কাছে গ্রামের বাড়িতে ঈদ করার মজাটাই নাকি আলাদা। চাচাতো ভাই-বোনদের সাথে ঘুরে বেড়ানো যায়। হৈ-হুল্লোড় করা যায়। মেলায় যাওয়া যায়। নদী-পাখি, বন-বনানী কত কি দেখা যায়। আমি ওর কথায় সায় দেই। আমাদের আগ্রহ দেখে বাবা-মা সিদ্ধান্ত নেন গ্রামেই ঈদ করবেন। ঈদের একদিন আগে আমরা গ্রামে এসে পৌঁছি। ঈদে বাড়ি আসতে পথে যে কত ধকল সহ্য করতে হয়। তারপরও আমাদের বাস জার্নিটা খুব উপভোগ্য হয়। প্রায় অর্ধশত গাড়ি এক সারিতে ছুটে চলে। সবাই ঈদে ঘরমুখী। মনে হয় একটা আনন্দ মিছিল। অথবা ঈদে বাড়ি যাওয়ার এক বিশাল লংমার্চ। অপরাহ্নের কিছু আগে আমাদের গাড়ির বহর যমুনা সেতুতে এসে ওঠে। বিরাট সেতু দেখে প্রাণটা জুড়িয়ে যায়। সাবা চিৎকার করে ওঠে এই তো আমরা এসে পড়েছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা বাঘাবাড়ি বন্দরে এসে পৌঁছি। এখান থেকে বড়াল নদী দিয়ে নৌকায় গ্রামে যেতে হবে। আমাদের গ্রামের নাম সোনাপুর। ঠিক যেন সোনার মতই। নদী তীরে ছিমছাম, ছায়াসুনিবিড় একটি ছোট্ট গ্রাম। শীতকালে বড়াল নদীতে তখন পানি থাকে না। বর্ষার পানি নেমে গেলেও এখনো নৌকা চলার মত পানি আছে। তাই রিকশা বা ভ্যান গাড়িতে চাপতে হয় নি। আমরা সবাই মিলে নৌকা ভ্রমণটা বেশ এনজয় করি।

গল্পে গল্পে অনেক রাত হল। কথা আর শেষ হয় না। ঈদ-উত্তেজনায় ভাই-বোনদের চোখে ঘুম নেই। নতুন পোশাক, ঈদের মাঠে যাওয়া, ঘুরে বেড়ানো, বন্ধুদের মিষ্টিমুখ করানো-এই নিয়ে যত কথার ফুলঝুড়ি। ছোট চাচার ছেলে সিয়াম। ও ঈদের জামা কাউকে দেখাচ্ছে না। দেখালে পুরানো হয়ে যাবে! ওকে নিয়ে সবাই মজা করছে। আমি অবশ্য ইতোমধ্যেই একবার নতুন পোশাক পরে ফেলেছি। এই নিয়ে কাজিনদের মধ্যে হাসির রোল পড়ে যায়।

একে একে সবার চোখে রাজ্যের ঘুম এসে ভর করে। পুরানো চিনা দেয়াল ঘড়িটার টিক টিক- টিক্ - টিক্ শব্দ শোনা যায়।

আনু ! আনু ! এ্যাই আনু ওঠ্! ঈদের মাঠ দেখতে যাবি না? কি সুন্দর সাজিয়েছে! আলো আঁধারিতে সাজানো মাঠ। ..... এত সুন্দর মাঠ! রঙ বেরঙের নিশান আর বেলুনে ছেয়ে গেছে। পাশ দিয়ে কুলকুল রবে বয়ে যাচ্ছে নদী।

শিশিরে-শিশিরে ভিজেছে সবুজ ঘাস। পায়ে কেমন শীতল পরশ লাগছে। খালি পায়ে এসেছি। অনেকদিন খালি পায়ে নরম ঘাসের উপর হাঁটা হয় না। বেশ

www.pathagar.com

লাগছে। পানু ভাইয়াটা যে কি! সাথে নিয়ে এসে কোথায় যে গেল ! এখনই ভোর হবে। ঐ তো একদল ছেলে সাদা সফেদ পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে, হাতে সবুজ নিশান নিয়ে এগিয়ে আসছে। ওরা তো আমাদেরই বাড়ির দিকে যাচ্ছে। হ্যাঁ ঐ তো হাসু! ওটা বুঝি হাসুরই দল।

..... আম্মু ওদের সেমাই পায়েশ মিষ্টি কত কি খেতে দিচ্ছেন। ছোট্ট ওই শিশুটির নাম কি? ও কেমন নিশান উঁচু করে ধরে আছে! আম্মু ওকে একটা নতুন জামা পরিয়ে দিলেন। ওর দু'ঠোঁটের রাশি-রাশি হাসি ঈদের একফালি বাঁকা চাঁদের মতই মনে হচ্ছে। শিশুটি কি মনে করে ওর হাতের নিশান আমাকে ধরিয়ে দিল। আমি নিশানটি উঁচু করে ধরলাম, আরো উঁচুতে।

ঃ আনু, সাবা তোমরা ওঠো ! ভোর হয়েছে। ফজরের নামাজ পড়বে।

- ঐ বাচ্চাটা কে মা?

ঃ কার কথা বলছিস বাবা?

ঃ না। কি-স-ব স্ব-প্ন।

ততক্ষণে খোলা জানালা দিয়ে ভোরের ফুরফুরে মৃদুমন্দ বাতাস আমাকে যেন জাগিয়ে তোলে ঈদের খুশিতে!!

www.pathagar.com

রতন

টেম্পোরা ভট্ ভট্ শব্দের সাথে পাল্লা দিয়ে রতন ডেকে চলেছে। মালিবাগ, মগবাজার, বাংলামটর, ফার্মগেট। ঝড়বেগে ডেকে চলেছে ও'। রতন শব্দের অপভ্রংশ এমনভাবে উচ্চারণ করছে, যেন ও' নগর সভ্যতাকেই ভ্রুকুটি করছে। কখন যে গাড়ি ভরে গেছে বুঝতে পারেনি। ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দেয়। ভিতর থেকে একজন চেচিয়ে ওঠে, এ্যাই পিচ্ছি গাড়িতে ওঠ। রতন বিদ্যুৎ বেগে দৌড়ে চলন্ত গাড়িতে উঠে পড়ে। জীবনের যেন এতটুকু মায়া নেই।

রতন মায়ার বাঁধন ছিঁড়েছে অনেক আগেই। সেই কবে বাবা মারা গেছে, তা ওর মনে নেই। রতন যখন কোলে তখন ওর মা শহরে আসে কাজের সন্ধানে। চাঁদপুর জেলার হাইমচরে ওদের বাড়ি। রতনের বাবার মৃত্যুর কয়েক বছর পর প্রমত্তা মেঘনার ভাঙ্গনে ওদের সামান্য ভিটে-মাটি নদী গর্ভে চলে যায়। তারপর থেকে ওরা নিঃস্ব রিক্ত। রতনের মা ঢাকা শহরে এসে কমলাপুর বস্তিতে একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নেয়। রতনের বয়স যখন চার বছর তখন ওর মা রোগে-

www.pathagar.com

শোকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। রতন হয়ে পড়ে একা। এতিম। জঠর জ্বালায় ভিক্ষা শুরু করে। রাজপথে ভিক্ষা করতে গিয়ে রতন একদিন গাড়ির নিচে পড়তে নেয়। টেম্পোর চালক শাহজাহান মিয়ার দৃষ্টিতে পড়ে রতন। সে দিনই শাহজাহান মিয়া ওকে টেম্পোর পাদানিতে তুলে দেয়। শুরু হয় রতনের হেলপারী জীবন। গাড়ির হেলপারী করতে গিয়ে প্রতিদিনই রতন নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করে। উপসাগরীয় যুদ্ধ, আমেরিকার টুইন টাওয়ারে হামলা, আফগান যুদ্ধ, তেলের বাজার চাঙ্গা, নতুন বাজেট এ সবই রপ্ত করতে হয় তাকে নইলে গাড়ির বাড়তি ভাড়াটা আদায় করবে কিভাবে।

ঃ দ্যান স্যার দ্যান ভাড়াটা দ্যান।

- মাস্তান গোছের একজন প্যাসেঞ্জার দুই টাকার একটা ছেঁড়া নোট এগিয়ে দেয়।

ঃ এ ট্যাহা বদলাইয়া দ্যান।

ঃ কি হইচে টাকার।

ঃ ছেড়া ট্যাহা লওন যাইব না।

- রক্তচোখা লোকটি তর্জনী আঙ্গুলটি সোজা করে ওর চোখে ঘা লাগিয়ে দেয়। বেটা বেশি কথা কইবি তো চাক্কার নিচে ফ্যালাইয়া দিমু।

-রতনের ডান চোখ দিয়ে দর দর করে পানি ঝরতে থাকে। রতন চোখ রগড়াতে- রগড়াতে বলে, দিন শ্যাষে তো ওস্তাদ আমারে বিশ ট্যাহা ধরাইয়া দিব। তখন এই ছেঁড়া ট্যাহা আমার ভাগে পড়ব। আর আপনি আমার চোখে ঘা লাগাইয়া দিলেন। এত গুলোন প্যাসেঞ্জার কারো কিছু কওন নাই।

- কথা শেষ না হতেই রতন গাড়ির ছাদে সজোরে একটা থাপ্পর বসিয়ে দেয়। এটা গাড়ি থামানোর সিগন্যাল। গাড়ি থেমে যায়।

ঃ কী হইচে রে?

ঃ এক বেটা আমার চোখে আঙ্গুল বসাইয়া দিছে।

ঃ ড্রাইভার শাহজাহান মিয়া লোহার একটা রড হাতে গাড়ি থেকে নেমে আসে। কোন হালার এত বড় সাহস !

- বড় রকমের একটা হট্টগোল বেঁধে যায়।

রতনের ঘুম ভেঙে যায়। দেখে টহল পুলিশ একটা লাঠি দিয়ে তাকে খোঁচাচ্ছে রাস্তার আইল্যান্ডে শুয়ে থাকার অপরাধে।

www.pathagar.com

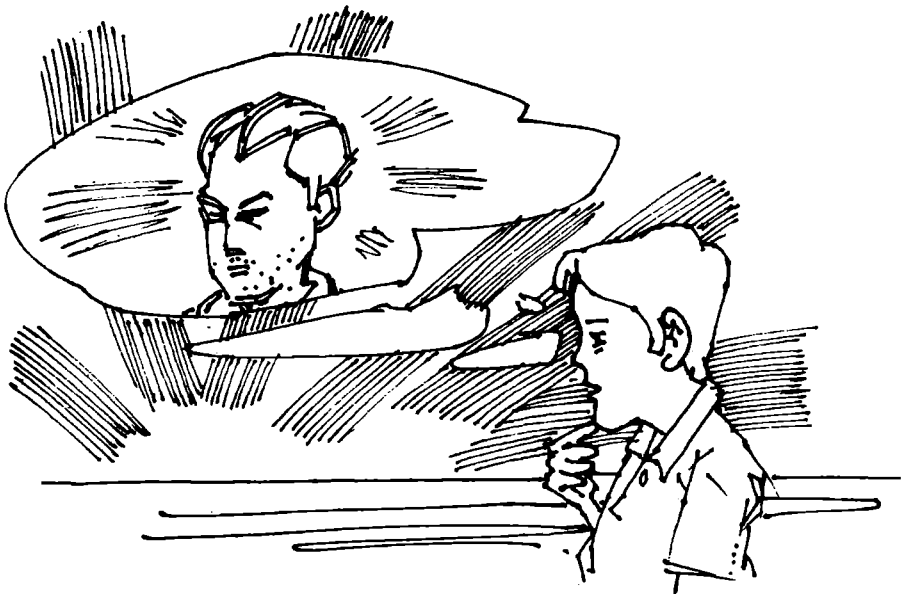

বাবা আসে নি

জানোস মা, চলন বিলে নাকি সোনা পাওয়া যায়।

ঃ ঠিকোই কইসোছ মা। চলন বিলের ধান, চলন বিলের মাছ ফলফলাদি সবই তো সোনা। কিন্তু সেই সব কি আর আমাগো কিসমতে আছে?

ঃ ক্যান নাই মা! আমরা গরিব সেই লাইগ্যা। দেইখো একদিন আমরা ঝিনুক কুড়ায়্যা ঠিকোই মুক্তা পামু। সেদিন আমাগো অ-নে-ক ট্যাহা হইব। আর কোন দুঃখ থাকব না।

লতাবানুর কথা শুনে জমিলা বিবি মেয়ের মুখের দিকে ছলছল চোখে তাকায়। ভাবে মানুষটা যদি বেঁচে থাকত, আমার স্বর্ণলতার কোন দুঃখ থাকত না। লতার মত তরতর করে বেড়ে ওঠা মেয়েটা আমার আজ এতিম।

ঃ কি ভাবছোস মা?

ঃ তোর কথা ভাবি। এ্যাই তুই আজ ডাঙ্গর হইছোস। তোর বাপে যদি আজ বাইচা থাকত তোরে কততো আদর যতনি করত।

জমিলা বিবি শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকে।

ঃ বাজানের কথা মনে করায়্যা দিয়া তোমাকে কষ্ট দিলাম।

www.pathagar.com

ঃ কষ্ট নারে মা, তোর বাপে তো আমাগো সবার গর্ব। তোর বাপে স্বাধীনতার জন্য জীবন দিছে। ক'দিন পর স্বাধনিতার দিন আসব, কতো মানষে তারে স্মরণ করব।

ঃ আইচ্ছা মা বাজানে কেমুন আছিল।

ঃ তোর বাপে খুব ভালা মানুষ আছিল রে। দ্যাখতে তোর লাহান সুন্দর আছিল। তুই তহন কোলে। ছয় মাস। দ্যাশের লাইগা সেই যে যুদ্ধে গেল আর ফিরল না। জমিলা বিবি একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, জানোস বানু, তোর বাপে সখ কইরা তোর নাম রাখছিল স্বর্ণলতা। আমাগো গ্রামের নামটা তোর নামের নাহাল। সোনাপুর।

চলন বিলের পাড়ে ছায়া ঢাকা পাখি ডাকা রোদ ঝলমলে একটি গ্রাম সোনাপুর। অনেক রাতে ডাহুকের ডাক, ভোরে বিলের পাড়ে বড় বড় ঢেউয়ের আছড়ে পড়ার শব্দ এ গ্রামের মানুষগুলোকে যেন প্রতিনয়তই সংগ্রামী করে তোলে।

স্বামী হারানোর পর শক্ত এক বালুচরে আটকে যায় জমিলা বিবির জীবনতরী। নদীর পানি কেটে জীবনের সে চর মাড়াতে হয় তাকে। স্বামী নজিবর রহমান যাবার আগে বলে গিয়েছিল আর যদি ফিরে না আসি মেয়েটাকে সোনার মত করে মানুষ করো। স্বামীর সেই স্বপ্ন বুকে আগলে ধরে জমিলা বিবি সংসারের হাল ধরেছে। জীবনের হাল আর নৌকার হাল আজ তাই একই সূতায় বাঁধা পড়েছে। স্বামীর রেখে যাওয়া ছোট্ট একটু বসত ভিটা আর একটা ডিঙ্গি নৌকা তাদের এখন একমাত্র সম্বল। চলন বিলে নৌকা বেয়ে শাপলা-শালুক তুলে, ঝিনুক কুড়ায়ে অথবা কাউকে গন্তব্যে পৌঁছে দিয়ে যে আয় হয় তাই দিয়ে তাদের সংসার চলে।

খোরস্রোতা চলনবিল আজ মৃত প্রায়। শুস্ক মৌসুমে বিলের বিস্তীর্ণ বুক জুড়ে ধান চাষ হয়। সুবজের সমারোহে ভরে যায় দিগন্ত জোড়া মাঠ। ধান কাটার মৌসুম এলে ধান কুড়ানোর ধুম পড়ে। তখন ভালই চলে তাদের।

জমিলা বিবি মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে। স্বর্ণলতা। মায়ে ডাকে লতাবানু। লতাবানু পঞ্চম শ্রেণীতে উঠেছে। মেয়েকে নিয়ে মায়ের অনেক ভাবনা। মেয়ে বড় হচ্ছে। আর কদিনই বা কাছে ধরে রাখতে পারবে। পরের ঘরে বউ হয়ে যাবে। স্বামীর স্বপ্ন কি সফল হবে। এসব ভাবনা জমিলা বিবিকে আচ্ছন্ন করে।

www.pathagar.com

লতাবানু নদীর মতই দুরন্ত। কৈশোর তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। মাঠে ঘাটে দৌড় ঝাপ পেড়ে, বন্ধুদের সাথে গোল্লাছুট ছি-বুড়ি খেলে সময় কাটে। সোনাপুরের ঝোপ-ঝাড় স্বর্ণলতায় ঘেরা। দূর থেকে মনে হয় সোনালী আলো ঝলমল করছে। লতাবানু কখনো এই আলোয় চোখ ম্যালে, তখন তার মনটা বিষাদে ভরে যায়। আব্বু কেমন ছিল। আব্বুর কোন স্মৃতি তার মনে পড়ে না। স্বর্ণলতার মায়ায় পড়েই হয়ত আব্বু তার নাম রেখেছিল স্বর্ণলতা।

লতাবানু এখন অনেক কিছু বুঝতে শিখেছে। মায়ের কষ্টের কথা বোঝে। পড়াশোনার ফাঁকে তাই লতাবানু মায়ের সাথে ঝিনুক কুড়াতে যায় বিলে। এলাকায় ঝিনুক-শামুকের বেশ চাহিদা। হাঁস-মুরগির খামারে এসব বিক্রি করে ভালই আয় হয়। চুনের আড়তেও ঝিনুক বিক্রি হয়। কিন্তু আগের মত আর বিলে ঝিনুক পাওয়া যায় না। আজকাল অনেকেই এ কাজে নেমেছে।

লতাবানু ঝিনুক পেলেই ভেঙ্গে দেখে ভিতরে মুক্তা আছে কি না। কোনদিন দু'একটা পেয়েও যায়। সেদিন তার আনন্দের সীমা থাকে না। সঙ্গীদের কাছে বাহবা নেয়। লতাবানু মুক্তা পেলেই সযতনে রেখে দেয়। ভাবে অনেকগুলো মুক্তা জড়ো হলে ও রেশমি সুতায় মালা গাঁথবে।

সেদিন আকাশে ছিল না চাঁদ। ওঠেনি তারারা। লতাবানু একটার পর একটা মুক্তা দিয়ে মালা গেঁথেই চলেছে। মুক্তার আলোয় ঝিলমিল করছে ওর দুচোখ। কাল আব্বু আসবে। ও আব্বুর হাতে তুলে দিবে মুক্তার মালা। অপেক্ষার রাত আর পোহাতে চায় না। শেষে ভোর হল। মুয়াজ্জিনের আজান ভেসে আসছে দূর থেকে। রক্তিম আভায় রঞ্জিত হল পূর্বাকাশ। নীল আকাশে লাল সূর্যটা ওর মালার মতই দেখাচ্ছে। লতাবানু এগিয়ে চলেছে। সামনে মিছিল আসছে লাখো মানুষের মিছিল। সবার মুখে নতুন দিনের আবাহন। হাতে সবুজে মোড়ানো লাল সূর্য। হ্যাঁ ওই মিছিলেই আব্বু আছে। লতাবানু ছুটছে। একদম মিছিলের কাছে এসে পড়েছে লতাবানু। এক ঝাঁক শ্বেত কপোত মিছিলের ওপর উড়ছে। কিন্তু না, ওর আব্বু আসেনি। লতাবানু বাজান বলে চিৎকার করে ওঠে। জমিলা বিবি পাশ ফেরে মেয়েকে কোলের ভিতর টেনে নেয়। ততক্ষণে সূর্যের মিষ্টি আলো জানালার শিক গলিয়ে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করছে। আলো ছায়ায় লতাবানুর মুখখানি স্বর্ণলতার মতই ঝলমল করছে।

www.pathagar.com

Estd-1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড

চট্টগ্রাম অফিস : নিয়াজ মঞ্জিল, ১২২, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম, ফোন : ৬০৭৫২০।

ঢাকা অফিস : ১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৫৬৯২০২।

www.pathagar.com